বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.)
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলীফা

বিশ্ব সংকট
ও
শান্তির পথ

বিশ্ব সংকট
ও
শান্তির পথ

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম এবং
মসীহ মাওঊদ (আ.)-এর পঞ্চম খলিফা-

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর

কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রের সংকলন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

প্রকাশক	মাহবুব হোসেন সেক্রেটারী এশায়াত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
গ্রন্থস্বত্ত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.
ভাষান্তর	ড. আবদুল্লাহ্ শামস বিন তারেক
প্রকাশকাল	প্রথম বাংলা অনুবাদ : আগস্ট, ২০১৪
সংখ্যা	১০০০ কপি
মুদ্রণে	ইন্টারকন এসোসিয়েটস ৫৬/৫ ফকিরেরপুল বাজার, মতিঝিল, ঢাকা।

WORLD CRISIS
AND
THE PATHWAY TO PEACE

A Compliation of Speeches
and Letters

by Hadhrat Mirza Masroor Ahmad[ai]
Imam and the Head of the Worldwide Ahmadiyya Muslim Jama'at,
Fifth Successor to the Promised Messaih[as], May Allah the almighty be his help

ISBN : 978-984-991-201-9

সূচীপত্র

বক্তৃতাসমূহ

বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট পত্র

লেখক পরিচিতি

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান। তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আঃ)-এর প্রপৌত্র এবং পঞ্চম খলীফা।

তিনি ১৯৫০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের রাবওয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মনসুর আহমদ ও মাতা নাসিরা বেগম আহমদ। ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিষয়ক অর্থনীতিতে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করে তিনি ইসলামের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা তাঁকে ১৯৭৭ সালে ঘানায় নিয়ে যায় যেখানে বহু বছর ধরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন স্কুলের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আহমদীয়া সেকেন্ডারি স্কুল সালাগা প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন। সেখানে তিনি স্কুলটির প্রথম দুই বছর অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

২০০৩ সালের ২২শে এপ্রিল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা পদে আজীবনের জন্য নির্বাচিত হয়ে বর্তমানে তিনি নিখিল-বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংগঠনের দায়িত্ব পালন করছেন যেখানে ২০২টি দেশে এই সংগঠনের লক্ষ লক্ষ সদস্য রয়েছে।

খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি প্রিন্ট এবং ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছানোর জন্য একটি বিশ্বব্যাপী কর্মসূচি পরিচালনা করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন দেশীয় শাখাগুলো বিস্তারিত কর্মসূচি চালু করেছে যেখানে ইসলামের প্রকৃত শান্তির বাণী প্রতিফলিত হয়।

বিশ্বজুড়ে আহমদী মুসলিমগণ অপরাপর মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় শান্তির প্রচারপত্র বিতরণ, আন্তঃধর্মীয় এবং শান্তি সম্প্রীতি সভা ও পবিত্র কুরআনের প্রকৃত ও মহৎ বাণী প্রচারে বিভিন্ন উপস্থাপনা আয়োজন সহ নানা চেষ্টা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। এসব কর্মসূচি বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে এবং প্রমাণ করতে পেরেছে যে ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে নিজ দেশের প্রতি অনুগত এবং মানবসেবার উন্নয়নে সবচেয়ে অগ্রগামী।

২০০৪ সালে তিনি বার্ষিক ন্যাশনাল পিস সিম্পোজিয়াম চালু করেন। সেখানে সমাজের সর্বস্তর থেকে অতিথিবৃন্দ শান্তি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তাধারা বিনিময় করতে আসে। প্রতিবছর এই আলোচনাসভা অনেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তিনি মানবসেবা সমুন্নত এবং সহজতর করার জন্য বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অনেক স্কুল এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে যেগুলো বিশ্বের দুর্গম অঞ্চলে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকে।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বর্তমানে ইংল্যান্ডের লন্ডনে বসবাস করছেন। বিশ্বব্যাপী আহমদী মুসলিমদের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে তিনি ইসলামের শাশ্বত শান্তির বাণী প্রচারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।
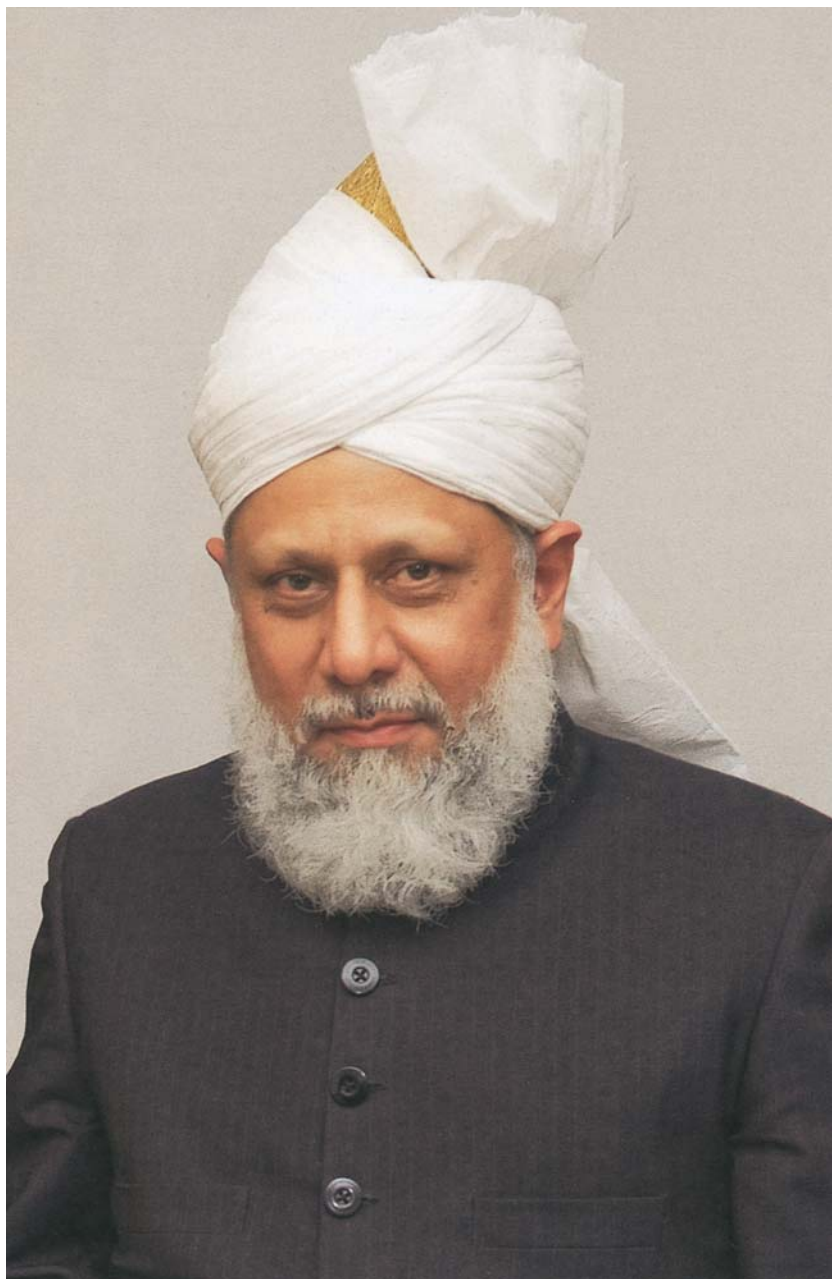
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ আল খামেস

বাংলা প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ শীর্ষক বইটি নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমাম ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর কতিপয় বক্তৃতা ও পত্রাবলির সংকলন। এটি ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লিঃ কর্তৃক ২০১৩ সালে প্রকাশিত ৩য় সংস্করণের বাংলা অনুবাদ। মারকযের নির্দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এটি প্রকাশ করছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর শতবর্ষ উদ্‌যাপনে এ প্রকাশনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে, ইনশাআল্লাহ্।

বইটির অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন ড. আব্দুল্লাহ শামস বিন তারিক। তার পূর্বেই দ্বিতীয় বক্তৃতাটির (জার্মানীতে প্রদত্ত) একটি অনুবাদ করেছিলেন জনাব মহিউদ্দিন অভি, যার পরিমার্জন তিনি করেছেন। চতুর্থ বক্তৃতাটি (যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে প্রদত্ত) অনুবাদ করেছে [বাংলা ডেস্ক, লন্ডন]। পটভূমির বিষয়াবলি ও অতিথি তালিকা, অপর দু'টি বক্তৃতা ও পত্রসমূহ মূল অনুবাদক অনুবাদ করেছেন।

জামাতের প্রকাশনা সেক্রেটারী জনাব মাহবুব হোসেন সাহেব কয়েক বন্ধুর সহযোগিতায় এর প্রুফ দেখে মুদ্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। আল্লাহ্‌তাআলা বইটি প্রকাশে অনুবাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের অবদানের জন্য উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

আলহাজ্ব মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ
১৯ জুলাই, ২০১৪ খ্রি.

মূল ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্ব এখন অতি দুর্যোগময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট প্রায় প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ও গভীরতর বিপদের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগের সাথে এর তুলনা বারবার উচ্চারিত হচ্ছে আর স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে যে, ঘটনাবলী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে দ্রুত গতিতে এক ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে অনুভূত হচ্ছে যে অবস্থা দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, আর মানুষ পথ চেয়ে আছে যে কেউ ময়দানে অবতীর্ণ হবেন এবং নিরেট বাস্তবতার নিরিখে যথাযথ ও শক্তিশালী (concrete, solid) দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন যার উপর তারা ভরসা রাখতে পারে আর যা তাদের হৃদয়ের ও মনের কথা বলবে আর তাদের মনে এ আশার সঞ্চার করবে যে এমন পথ রয়েছে যাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একটি পারমাণবিক যুদ্ধের পরিণাম এতটাই প্রলয়ঙ্করী যে বিষয়ে চিন্তা করতেও কেউ সাহস করে না।

এখানে, এ বইটিতে, আমরা নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর পথনির্দেশনাসমূহ সংকলন করেছি। গত কয়েক বছর ধরে, ঘটনাক্রম উন্মোচিত হতে হতে, তিনি নির্ভীকভাবে বিশ্বের সামনে ঘোষণা দিয়ে এসেছেন কোন দিকে সব কিছু অগ্রসর হচ্ছে- আতঙ্ক সৃষ্টি করতে নয়, বরং এ চিন্তার জন্য প্রস্তুত করতে যে, কেন বিশ্ব আজ এ অবস্থায় উপনীত আর কিভাবে বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে এবং কিভাবে এ বিশ্ব পল্লীতে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার এক পথ রচনা করা যায়। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে বিশ্বের জন্য শান্তি নিশ্চিত করার একটিই পথ আর তা হল বিশ্ব যেন বিনয় ও ন্যায়ের দিকে ঝুঁকে আর অবনত মস্তকে খোদাতাআলার দিকে মুখ ফিরায়; মানুষ যেন মনুষত্ব প্রদর্শন করে আর শক্তিশালীরা (স্ববলরা) যেন দুর্বলের সাথে মর্যাদাবোধ ও শ্রদ্ধা এবং ন্যায়ের সাথে আচরণ করে আর দুর্বল ও দরিদ্ররাও যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে আর সকলে যেন তাদের স্রষ্টার দিকে একান্ত বিনয় ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে প্রত্যাবর্তন করে।

বার বার তিনি আমাদের এক এক করে প্রত্যেককে স্মরণ করিয়েছেন যে, ধ্বংসের কিনারা থেকে ফিরে আসার পথ হল জাতিসমূহের পারস্পরিক সকল লেন-দেনে ন্যায়কে যেন এক অপরিত্যাজ্য শর্ত গণ্য করে। এমনকি যদি তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতাও থাকে তবু তাদের জন্য ন্যায়ের অবলম্বন আবশ্যক, কেননা ইতিহাস আমদেরকে শিখিয়েছে যে ভবিষ্যতের সকল প্রকার বিদ্বেষের চিহ্নকে নির্মূল করে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার এটিই একমাত্র পথ। এটিই পবিত্র কুর'আনের সেই শিক্ষা বিশ্ব নেতৃবর্গের কাছে লেখা পত্রসমূহে তিনি যার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন:

> মসজিদে-হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাধা দেয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন সীমালঙ্ঘনে তোমাদের প্ররোচিত না করে। এবং তোমরা পুণ্য এবং তাক্ওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহর তাক্ওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।' (৫:৩)

ইসরায়েলের প্রধান মন্ত্রীর কাছে লেখা পত্রে তিনি লেখেন:

> অতএব, আপনার কাছে আমার আবেদন এই যে, বিশ্বকে একটি বিশ্বযুদ্ধের করালগ্রাসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব না দিয়ে, পৃথিবীকে একটি বিশ্বজনীন ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষার জন্য আপনার সর্বোচ্চ প্রয়াস গ্রহণ করবেন। বিরোধসমূহ নিরসনে বলপ্রয়োগ না করে, আপনাদের প্রয়াস হওয়া উচিত যেন সংলাপের মাধ্যমে এগুলোর সুরাহা হয়, যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রতিবন্ধিতা ও জন্মগত ত্রুটিসমূহ 'উপহার' দেয়ার পরিবর্তে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারি।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতিকে সতর্ক করে তিনি লেখেন:

> বিশ্বে বর্তমানে খুব উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে, আর অন্যত্র পরাশক্তিগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক দেশ তার কর্মকাণ্ডে অন্য কোন দেশকে হয় সমর্থন করছে বা বিরোধিতা করছে; তবে, ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হচ্ছে না।

> পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি ওবামাকে তিনি লেখেন:

> যেমনটি আমরা সকলে অবহিত আছি, যে মূল বিষয়গুলো পৃথিবীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল তা হল লীগ অফ নেশন্স-এর ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক মন্দা, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৩২ সালে। আজ শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সাথে ১৯৩২ সালের পরিস্থিতির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির কারণে আবারো ছোট ছোট দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করেছে, আর দেশগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে এমন শক্তিসমূহ সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে যারা আমাদেরকে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। যদি ছোট ছোট দেশগুলোতে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধসমূহের নিস্পত্তি সম্ভব না হয়, এর ফলস্বরূপ বিশ্বে নতুন মেরুকরণ ও গ্রুপিং-এর উদ্ভব হবে। এটিই হবে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। তাই আমার বিশ্বাস যে আজ, বিশ্বের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা এ ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করি। মানবজাতির জন্য আশু প্রয়োজন তার সেই একক খোদাকে চেনার, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা; কেননা একমাত্র সেটাই মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দান করতে পারে; নতুবা বিশ্ব ক্রমাগত দ্রুতগতিতে আত্মহননের পথে অগ্রসর হতে থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রিমিয়ার ওয়েন জিয়াবাও-কে তিনি লেখেন:

> আমার দোয়া এই যে, বিশ্বের নেতৃবৃন্দ যেন প্রজ্ঞার সাথে আচরণ করেন এবং বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিদ্যমান পারস্পরিক শত্রুতাসমূহকে বিস্ফোরিত হয়ে এক বিশ্বজনীন সংঘাতে পরিণত হওয়ার সুযোগ না দেন।

আর যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি লেখেন:

> এটা আমার অনুরোধ যে, প্রত্যেক স্তরে এবং প্রত্যেক আঙ্গিকে আমাদেরকে ঘৃণার আগুন নির্বাপিত করার সর্বোচ্চ প্রয়াস নিতে হবে। কেবলমাত্র যদি আমরা এ চেষ্টায় সফল হতে পারি তবেই আমাদের অনাগত প্রজন্মসমূহের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিতে পারবো। কিন্তু, যদি এ কাজে আমরা ব্যর্থ হই, তবে আমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে পারমাণবিক যুদ্ধের কারণে সর্বত্র আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহকে আমাদের কর্মের ভয়াবহ পরিণাম বহন করতে হবে, আর পৃথিবীকে এক বিশ্বজনীন বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কখনো তাদের অগ্রজদের ক্ষমা করবে না। আমি আবার স্মরণ করাচ্ছি যে ব্রিটেন ঐ সকল দেশের অন্যতম যারা উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রভাব রাখতে পারে এবং রেখে থাকে। আপনারা চাইলে ন্যায় ও সমতার দাবি পূরণ করে বিশ্বকে পথ দেখাতে পারেন। তাই ব্রিটেন এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তির উচিত বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। সর্বশক্তিমান খোদা আপনাকে ও অন্যান্য বিশ্ব নেতাকে এ বার্তা অনুধাবনের তৌফিক দিন।

এটি আমাদের আন্তরিক দোয়া যে এখানে সংকলিত দিকনির্দেশনা যেন মানবজাতির এ ভয়াবহ বিপদের দিনে পথ প্রদর্শনের এক উৎস হয়, যেন ন্যায় ও বিনম্রতার নীতির উপর আমল করে আর খোদাতাআলার দিকে ঝুঁকে, মানবজাতি এক স্থায়ী শান্তির আশীষ লাভ করতে সক্ষম হয়। আমিন।

প্রকাশক

বক্তৃতাসমূহ

বিশ্ব সংকট ও

ইসলামি দৃষ্টিকোণ

ব্রিটিশ সংসদ, হাউজ অব কমন্‌স

লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ২০০৮
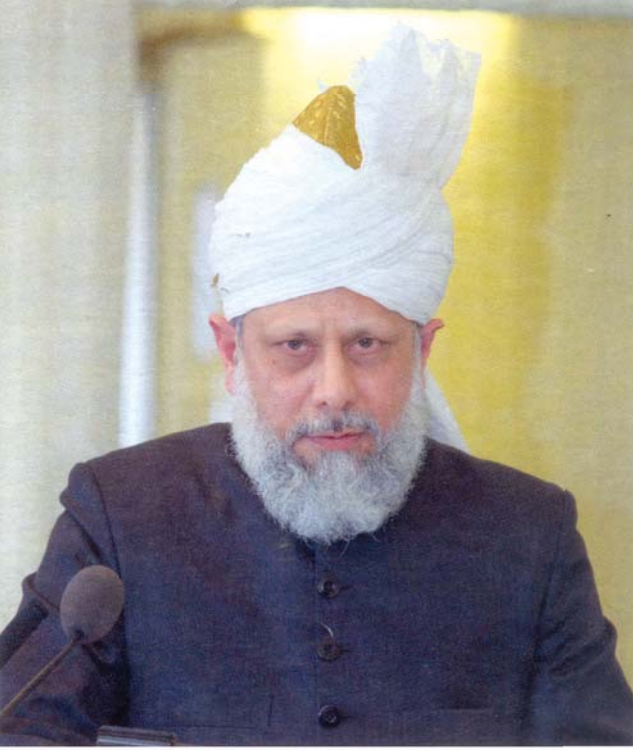
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ ৫ম (আই.)
হাউজ অব কমন্স-এ মূল বক্তব্য পেশ করছেন
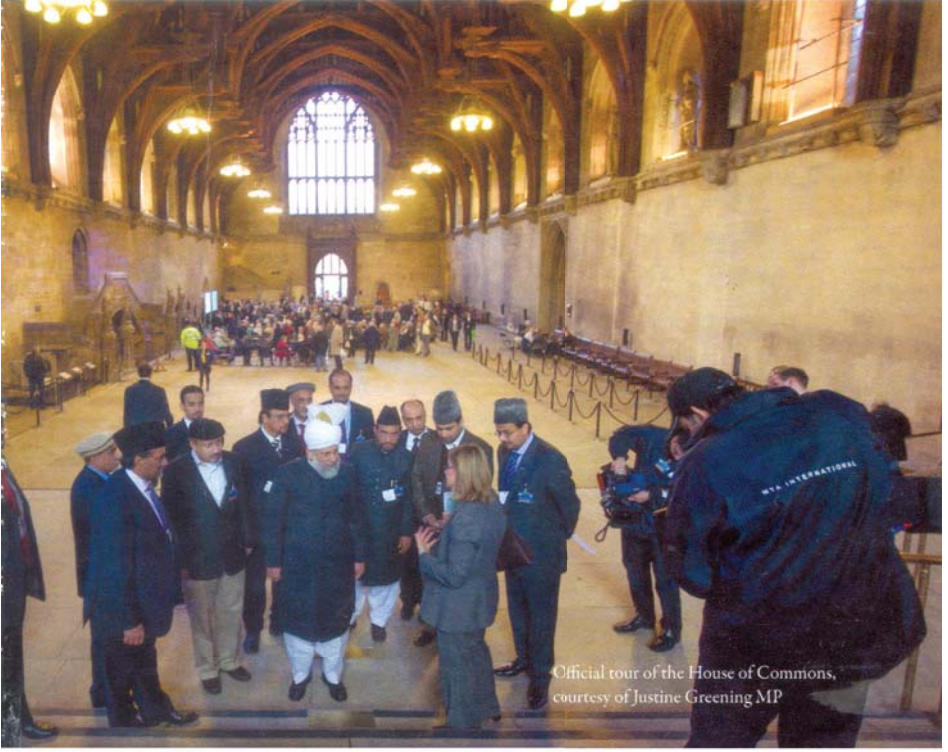
Official tour of the House of Commons,
courtesy of Justine Greening MP

জাষ্টিন গ্রিনিং এমপি.-এর সৌজন্যে হাউজ অব কমন্স-এ
হুযূর (আই.)-এর দাপ্তরিক সফর।

বসা: লর্ড অ্যাভেব্যুরি (লিবারেল ডেমোক্র্যাটস স্পোক্সম্যান ফর ফরেন এফেয়ার্স) আরটি. অন. হ্যাজেল ব্লেয়ার্স এমপি. (সেক্রেটারী অব স্টেট ফর কমিউনিটিস এন্ড লোকাল গভার্ণমেন্ট); হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ ৫ম (আই); জাষ্টিন গ্রিনিং-এমপি. (স্যাডো ট্রেজারী মিনিস্টার); গিলিয়ান মেরণ এমপি. (ফরেন অফিস মিনিস্টার); কাউন্সিলর লুইস হাইয়ামস্ (দি লর্ড মেয়র অব ওয়েষ্টমিনিস্টার);
দাড়ানো: জেরেমাই হান্ট এমপি. (স্যাডো কালচার মিনিস্টার); রফিক হায়াত (ইউকে. আহমদীয়া জামাতের ন্যাশনাল আমীর); ভিরেন্দ্র শারমা এমপি. আরটি. অন. মালকম উইক্স এমপি. (ফর্মার মিনিষ্টার অ্যাট ডিপার্টমেন্ট ফর বিজিনেস, এন্টারপ্রাইজ এন্ড রেগুলেটরি রিফর্ম); রব মারিস এমপি.
সাইমন হাগেস এমপি. (প্রেসিডেন্ট অব দি লিবারেল ডেমোক্র্যাটস পার্টি); মার্টিন লিনটন এমপি. এলান কীন এমপি.

পটভূমি

২২শে অক্টোবর, ২০০৮ যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্‌স (ব্রিটিশ সংসদ)-এ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ।

আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তীর সম্মানে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের কেন্দ্র ফযল মসজিদ এর নির্বাচনী এলাকা পাটনীর সংসদ সদস্য জাস্টিন গ্রীনিং আয়োজিত সংবর্ধনায় এ বক্তৃতা প্রদান করা হয়।

এ সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন গিলিয়ান মেরন এম.পি., রাইট অনারেবল হেযেল ব্লেয়ার্‌স এম.পি., এ্যালান কীন এম.পি., ডমিনিক গ্রীভ এম.পি., সাইমন হিউস এম.পি., লর্ড এরিক এভবারী এবং আরো বিশিষ্ট সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য পেশাজীবী।

বিশ্ব সংকট ও ইসলামি দৃষ্টিকোণ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

প্রথমত: আমি সকল সম্মানিত অতিথি, সংসদ সদস্য এবং রাইট অনারেবলগণের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা একটি ধর্মীয় সংগঠনের প্রধানকে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য জাস্টিন গ্রীনিং-এর কাছে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যিনি খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর সংসদীয় এলাকায় ছোট্ট একটি সম্প্রদায়ের জন্য এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে গিয়ে অনেক কিছু করেছেন। এটি তাঁর মহানুভবতা, ঔদার্য্য এবং তাঁর সংসদীয় এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের আবেগ-অনুভূতির প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতারই বহি:প্রকাশ।

যদিও আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় একটি ছোট সম্প্রদায়, এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার পতাকা বহন করে এবং এর প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। উপরন্তু, আমি এটিও বলতে চাই যে, যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী এ দেশের অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাগরিক এবং এ দেশকে ভালোবাসে; আর এটা আমাদের নবী (সা.)-এর শিক্ষার কারণে, যিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।* ইসলামের শিক্ষার আরো বিশদ ব্যাখ্যা এবং এর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, যাকে আমরা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ও বর্তমান যুগের সংস্কারক হিসেবে বিশ্বাস করে থাকি।

তিনি বলেন যে, আল্লাহতাআলা তাঁর এ দাবির ঘোষণার মাধ্যমে তাঁর উপর দু'টি দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। একটি হল খোদার অধিকার আরেকটি খোদার সৃষ্টির অধিকার। তিনি আরো বলেন যে, খোদার সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার প্রদান করার বিষয়টি এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন একটি চ্যালেঞ্জ।**

---

* তফসীরে হাক্কী, সূরা আল-কাসাস:৮৬, ফতহুল বারী ফী শরহে সহীহ আল-বুখারী, বাব কওলুল্লাহি তা'লা ওয়া'তুল বুইউতা...এবং তোহফাতুল আহওয়াযী শরহে জামি আত্-তিরমিযী, বাব মা ইয়াকূল

** মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা. ৩২৬

খিলাফত নিয়ে আপনাদের এ শঙ্কা থাকতে পারে যে, একটি সময় আসতে পারে যখন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে এবং এ ধরনের নেতৃত্বের ফলস্বরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি হবে। তথাপি আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, আল্লাহ্ চাহে তো আহমদীয় খিলাফত সর্বদা এ পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্যের পতাকাবাহী হিসেবে পরিচিত থাকবে, এবং সদস্যগণ নিজ নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দীর উদ্দেশ্যকে বিস্তার দান করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আহমদীয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ খিলাফতকে নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার বিন্দু মাত্র কারণ নেই। এ খিলাফত এ সম্প্রদায়ের সদস্যদের দৃষ্টি সেই দু'টি অধিকার আদায়ের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে যার জন্য মসীহ্ মাওঊদ (আ.) এসেছেন, আর এভাবে বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

এখন সময়ের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে আমি মূল বিষয়ে ফিরে আসি। যদি আমরা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিগত কয়েকটি শতাব্দীকে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা লক্ষ্য করি যে এ সময়ের সংঘটিত যুদ্ধগুলো প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল না। বরং এগুলো মূলত: ভৌগলিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতির। এমনকি আজকাল জাতিসমূহের মধ্যে যে সকল বিরোধ ও সহিংসতা দেখা যাচ্ছে, আমরা লক্ষ্য করি যে, রাজনৈতিক, ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকেই এদের উদ্ভব হচ্ছে।

আমাদের আশঙ্কা যে, আজ ঘটনাবলী যে দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গতিধারা একে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। কেবল বিশ্বের দরিদ্রতর দেশগুলো নয়, বরং উন্নত দেশগুলোও আজ এ পরিস্থিতির মুখোমুখি। সুতরাং এটা পরাশক্তিগুলোর দায়িত্ব যে তারা যেন আলোচনায় বসে এবং মানবতাকে ধ্বংসযজ্ঞের কিনারা হতে উদ্ধার করে।

ব্রিটেনও ঐ সকল দেশের অন্তর্ভুক্ত যারা উন্নত বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তা করেও থাকে। আপনারা যদি চান সমতা ও ন্যায়ের দাবি পূরণ করে বিশ্বকে পথ দেখাতে পারেন।

যদি আমরা নিকট অতীতের দিকে তাকাই, ব্রিটেন বহু দেশের উপর রাজত্ব করেছে বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশে ন্যায় বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার এক উঁচু মান প্রতিষ্ঠা করেছে। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ের সাক্ষী, এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা (আ.) ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়-বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নীতিসমূহের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যখন

আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা (আ.) মহা রানী ভিক্টোরিয়াকে তাঁর হীরক জয়ন্তীতে অভিনন্দন বার্তা পাঠান এবং তাঁকে ইসলামের বাণী পৌঁছান, তিনি বিশেষ দোয়া করেন যেন সর্বশক্তিমান খোদা ব্রিটিশ সরকার যেভাবে ন্যায় বিচার ও সমতার দাবি পূরণ করে থাকে, তা দৃষ্টিপটে রেখে খোদাতা'লা যেন তাদেরকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করেন।

অতএব, আমাদের ইতিহাস সাক্ষী যে যখনই ব্রিটেন ন্যায় বিচার করেছে, আমরা সব সময় তা স্বীকার করেছি, আর আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতেও সর্বদা ন্যায়-বিচার ব্রিটিশ সরকারের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে বজায় থাকবে, কেবল ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নয় বরং সকল ক্ষেত্রে, এবং কোন দিন যেন আপনাদের অতীত গুণাবলী আপনারা বিস্মৃত না হন।

আজ বিশ্বে বড় উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। আমরা দেখি এক দিকে ক্ষুদ্র-পরিসরে যুদ্ধসমূহের সূত্রপাত হচ্ছে, আর আরেকদিকে পরাশক্তিগুলো দাবি করছে যে তারা শান্তি প্রচেষ্টায় রত এবং তা প্রতিষ্ঠা করছে। যদি ন্যায়ের দাবি পূর্ণ করা না হয় তবে, এসকল স্থানীয় যুদ্ধে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের শিখা বিস্তার লাভ করে সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টন করতে পারে। সুতরাং, আপনাদের কাছে আমার বিনম্র আবেদন যে বিশ্বকে এ ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করুন।

এখন আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করবো বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা কি, বা কিভাবে এ শিক্ষাসমূহের আলোকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এটি আমার প্রার্থনা যে, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এ বাণীর প্রথম সম্বোধিত যারা- অর্থাৎ মুসলমানেরা- যেন এর উপর কার্য সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু, এর পাশাপাশি এটি বিশ্বের সকল দেশ, সকল পরাশক্তি ও সকল সরকারের দায়িত্ব যে সে অনুসারে কার্য সম্পাদন করা।

আজকের এ যুগে যখন পৃথিবী আক্ষরিক অর্থেই এক বিশ্বপল্লীতে রূপান্তরিত হয়েছে এমনভাবে যা অতীতে অকল্পনীয় ছিল, আমাদের জন্য আবশ্যক যে আমরা মানুষ হিসেবে আমাদের দায়িত্বকে অনুধাবন করি এবং মানবাধিকারের ঐ সকল সমস্যা সমাধানে মনোনিবেশ করি যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। স্পষ্টত: এ প্রচেষ্টার ভিত্তি হতে হবে ন্যায়-নীতি এবং সুবিচারের দাবিকে পূর্ণ করা।

আজকের সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে ধর্মের কারণে উদ্ভূত হয়েছে। মুসলমানদের কতিপয় গোষ্ঠি অবৈধ উপায় ও আত্মঘাতী বোমা ব্যবহার করে, ধর্মের নামে সামরিক ও বেসামরিক অমুসলিমদের হত্যা ও ক্ষয়-ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি নিরীহ মুসলমান ও শিশুদের পর্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। এ নিষ্ঠুর আচরণ ইসলামের দৃষ্টিতে একান্ত অগ্রহণযোগ্য।

কতিপয় মুসলমানের এ ঘৃণ্য আচরণের ফলে অমুসলিম দেশসমূহে সম্পূর্ণ এক ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ সমাজের এক শ্রেণী প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করেছে, আর অন্যরা, যদিও প্রকাশ্যে কথা বলছে না, নিজ অন্তরে ইসলাম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করছে না। এটি পশ্চিমা তথা অমুসলিম দেশসমূহের মানুষের হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে, আর গুটি কতক মুসলমানের এ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে, পরিস্থিতির উন্নতির পরিবর্তে, অমুসলিমদের প্রতিক্রিয়া দিন দিন মন্দের দিকে যাচ্ছে।

[পশ্চিমা বিশ্বের] এ ভুল প্রতিক্রিয়ার একটি প্রাথমিক পর্যায়ের উদাহরণ হল ইসলামের মহানবী (সা.)-এর চরিত্র এবং মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কুর'আনের উপর আক্রমণ। এ বিষয়ে দল-মত নির্বিশেষে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য কতিপয় দেশ থেকে ভিন্ন, আর এজন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এভাবে কারো অনুভূতিতে আঘাত করার ফলে পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ বাড়ানো ছাড়া কি লাভ হতে পারে? এ ঘৃণাই কিছু চরমপন্থী মুসলমানকে 'অনৈসলামিক' কর্মে প্ররোচিত করে, যা পালাক্রমে আবার কিছু সংখ্যক অমুসলিমকে তাদের বিদ্বেষ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

কিন্তু, যারা চরমপন্থী নন আর গভীরভাবে ইসলামের মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসেন তারা এ আক্রমণসমূহে গভীরভাবে মর্মাহত হন, আর এর শিরোভাগে রয়েছে আহমদীয়া জামা'ত। আমাদের একমাত্র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বিশ্বের সামনে মহানবী (সা.)-এর অনুপম চরিত্র ও ইসলামের অনিন্দ্যসুন্দর শিক্ষাকে তুলে ধরা। আমরা, যারা সকল নবী (আ.)-এর সম্মান ও শ্রদ্ধা করি এবং তাদের সকলকে খোদাতাআলার প্রেরিত পুরুষ বলে বিশ্বাস করি, কখনো তাদের কারো প্রতি অসৌজন্যমূলক কোন উক্তি উচ্চারণ করতে পারি না। কিন্তু, আমরা গভীরভাবে ব্যথিত হই যখন আমাদের নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন, অসত্য অভিযোগ আরোপ করা হয়।

আজকাল যখন বিশ্ব পুনরায় ব্লকে বিভক্ত হচ্ছে, চরমপন্থী মনোভাব তীব্রতর হচ্ছে, আর অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত মন্দের দিকে যাচ্ছে, তখন সকল প্রকার ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করে শান্তির ভিত্তি স্থাপন অত্যাবশ্যক। এটা কেবল একে অপরের সকল প্রকার আবেগ-অনুভূতির দিকে দৃষ্টি রাখার মাধ্যমেই সম্ভব। যদি তা সঠিকভাবে, আন্তরিকতার সাথে এবং প্রকৃত সদুদ্দেশ্য নিয়ে না করা হয়, তবে তা (বিরাজমান অস্থিরতা) বাড়তে বাড়তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

আমি কৃতজ্ঞ যে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর পশ্চিমা দেশগুলো উদারতার সাথে দরিদ্র বা অনুন্নত দেশের মানুষকে তাদের দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছে, আর তাদের মধ্যে মুসলমানেরাও রয়েছে। প্রকৃত ন্যায়-বিচারের দাবি এই যে, এদের আবেগ-অনুভূতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতিও সম্মান দেখানো হয়। এটাই সেই পথ যেটিতে মানুষের মনের শান্তি বজায় থাকবে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে যখন ব্যক্তি পর্যায়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত হয় তখন সামাজিক পর্যায়েও মনের শান্তি বিঘ্নিত হয়।

যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, আমি ব্রিটিশ সাংসদ ও রাজনীতিবিদদের কাছে কৃতজ্ঞ যে তাঁরা ন্যায়ের দাবি পূরণ করেছেন এবং এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নি। বস্তুতঃ এটিই ইসলামের শিক্ষা যা পবিত্র কুর'আনের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করে যে,

'ধর্মের বিষয়ে কোন জোর-জবরদস্তি নাই ...' (২:২৫৭)

এ আদেশ কেবল এ আপত্তিরই খণ্ডন করে না যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচার করা হয়েছিল, পরন্তু, মুসলমানদের এ কথাও বলে দেয় যে কারো ঈমানের গ্রহণযোগ্যতা সেই ব্যক্তি এবং তার খোদার মধ্যে একটি বিষয়, আর এ বিষয়ে কোনভাবে কারো হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রত্যেকের জন্য অনুমতি আছে তার নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করার এবং নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার। তবে, যদি ধর্মের নামে এমন কোন রীতি পালন করা হয় যা অন্যের ক্ষতি করে আর দেশের আইনের বিরুদ্ধে যায়, তবে, তখন রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারীগণ ব্যবস্থা নিতে পারেন, কেননা যদি কোন ধর্মে কোন নিষ্ঠুর রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত থাকে তবে তা খোদাতা'লার কোন নবীর শিক্ষা হতে পারে না।

আজকাল যখন বিশ্ব পুনরায় ব্লকে বিভক্ত হচ্ছে, চরমপন্থী মনোভাব তীব্রতর হচ্ছে, আর অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত মন্দের দিকে যাচ্ছে, তখন সকল প্রকার ঘৃণা-বিদ্বেষ দূর করে শান্তির ভিত্তি স্থাপন অত্যাবশ্যক। এটা কেবল একে অপরের সকল প্রকার আবেগ-অনুভূতির দিকে দৃষ্টি রাখার মাধ্যমেই সম্ভব। যদি তা সঠিকভাবে, আন্তরিকতার সাথে এবং প্রকৃত সদুদ্দেশ্য নিয়ে না করা হয়, তবে তা (বিরাজমান অস্থিরতা) বাড়তে বাড়তে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

আমি কৃতজ্ঞ যে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর পশ্চিমা দেশগুলো উদারতার সাথে দরিদ্র বা অনুন্নত দেশের মানুষকে তাদের দেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছে, আর তাদের মধ্যে মুসলমানেরাও রয়েছে। প্রকৃত ন্যায়-বিচারের দাবি এই যে, এদের আবেগ-অনুভূতি ও ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতিও সম্মান দেখানো হয়। এটাই সেই পথ যেটিতে মানুষের মনের শান্তি বজায় থাকবে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে যখন ব্যক্তি পর্যায়ের মনের শান্তি বিঘ্নিত হয় তখন সামাজিক পর্যায়েও মনের শান্তি বিঘ্নিত হয়।

যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, আমি ব্রিটিশ সাংসদ ও রাজনীতিবিদদের কাছে কৃতজ্ঞ যে তাঁরা ন্যায়ের দাবি পূরণ করেছেন এবং এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নি। বস্তুতঃ এটিই ইসলামের শিক্ষা যা পবিত্র কুর'আনের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুর'আন ঘোষণা করে যে,

'ধর্মের বিষয়ে কোন জোর-জবরদস্তি নাই ...' (২:২৫৭)

এ আদেশ কেবল এ আপত্তিরই খণ্ডন করে না যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচার করা হয়েছিল, পরন্তু, মুসলমানদের এ কথাও বলে দেয় যে কারো ঈমানের গ্রহণযোগ্যতা সেই ব্যক্তি এবং তার খোদার মধ্যে একটি বিষয়, আর এ বিষয়ে কোনভাবে কারো হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রত্যেকের জন্য অনুমতি আছে তার নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন যাপন করার এবং নিজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করার। তবে, যদি ধর্মের নামে এমন কোন রীতি পালন করা হয় যা অন্যের ক্ষতি করে আর দেশের আইনের বিরুদ্ধে যায়, তবে, তখন রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারীগণ ব্যবস্থা নিতে পারেন, কেননা যদি কোন ধর্মে কোন নিষ্ঠুর রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত থাকে তবে তা খোদাতা'লার কোন নবীর শিক্ষা হতে পারে না।

স্থানীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি স্থাপনের এটাই মৌলিক নীতি।

উপরন্তু, ইসলাম আমাদের শেখায় যে, যদি তোমার ধর্ম পরিবর্তনের কারণে কোন সমাজ, বা কোন গোত্র, বা কোন সরকার তোমার ধর্ম পালনে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে, আর এর পরবর্তীতে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে তোমার অনুকূলে চলে আসে, তাহলে সর্বদা মনে রাখবে যে তাদের প্রতিও তুমি কোন প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষ রাখবে না। তুমি তখন প্রতিশোধ নেয়ার চিন্তাও করবে না, বরং ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করবে। পবিত্র কুর'আনে বলে,

'হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এই অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার করো, ইহা তাক্‌ওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সবিশেষ অবহিত।' (৫:৯)

এটিই সমাজে শান্তির জন্য শিক্ষা। কখনও ন্যায় বিচার পরিত্যাগ করবে না- নিজের শত্রুর ক্ষেত্রেও না। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ শিক্ষার অনুসরণ করা হয়েছে আর ন্যায় বিচারের সকল দাবি পূরণ করা হয়েছে। আমি (আজ) অনেকগুলো উদাহরণ দিতে পারবো না, কিন্তু, ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে মক্কা বিজয়ের পরে মহানবী (সা.) ঐ সমস্ত লোকদের কারো প্রতি কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, যারা তাঁর উপর নিদারুণ নির্যাতন করেছিল আর তাদেরকে নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস বজায় রাখার ও পালনের অনুমতি দিয়েছিলেন। আজ, শান্তি কেবল তখনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন শত্রুর প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে ন্যায়ের সকল দাবি পূরণ করা হয়, কেবল ধর্মীয় চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষেত্রেই নয় বরং অন্য সকল ক্ষেত্রেও। আর কেবল এরূপ শান্তিই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

গত শতাব্দীতে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এর পিছনে যে কারণই থাকুক না কেন, যদি আমরা গভীর দৃষ্টিতে দেখি, কেবল একটি কারণ সবার উপরে মাথা চাড়া দিয়ে থাকে আর তা এই যে প্রথমবার যথাযথভাবে ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ করা হয় নি। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, যাকে নির্বাপিত আগুন মনে করা হয়েছিল, তা কেবল ধামা চাপা দেয়া আগুন সাব্যস্ত হল যা মৃদু মৃদু জ্বলছিল, আর পরিণামে লেলিহান অগ্নিশিখায় পরিণত হল এবং দ্বিতীয় বার পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে ফেলল।

আজ, অস্থিরতা বাড়ছে আর যুদ্ধসমূহ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপসমূহ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের পথ রচনা করছে। সর্বোপরি বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী এ পরিস্থিতিকে গুরুতর করে তোলার কারণ হবে।

পবিত্র কুর'আনে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সুবর্ণ নীতি বর্ণনা করেছে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে লোভে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। কখনো এটা নিজ ভৌগলিক সীমারেখার সম্প্রসারণে প্রকাশ পায়, আর কখনোবা প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ করায়ত্ত করার মধ্য দিয়ে, আর কখনো কেবলমাত্র অন্যের উপর নিজ আধিপত্যের নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এর ফলস্বরূপ নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটে- তা নির্দয় স্বৈরশাসকদের হাতে হোক, যারা নিজ জনগণের অধিকার হরণ করে এবং নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে, বা কোন আগ্রাসী শক্তির হাতে যারা বাইরে থেকে দেশে প্রবেশ করে। কখনো, নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত মানুষের কান্নার রোল বহির্বিশ্বের কানেও গিয়ে পৌঁছে।

এতে যাই হোক না কেন, আমাদেরকে মহানবী (সা.) এ সোনালী শিক্ষা দিয়েছেন যে, অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী উভয়কে সাহায্য কর।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন যে, একদিকে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো তারা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু, অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে? মহানবী (সা.) উত্তরে বললেন, 'তার হাতকে অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে, কেননা অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন তাকে খোদার শাস্তির পাত্র বানিয়ে দেয়।'* সুতরাং, তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমরা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা কর। আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রতম পরিসর (ব্যক্তি সত্তা)-কে ছাড়িয়ে এ নীতি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

> **'এবং যদি মো'মেনদের দুই দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তা হলে তাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাদের উভয়ের মধ্য হতে এক দল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে তাহলে তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে**

* সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইকরা, বাব ইয়ামীনির রাজুলি লি সাহিবিহী..., হাদীস নং ৬৯৫২

আজ, অস্থিরতা বাড়ছে আর যুদ্ধসমূহ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপসমূহ আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের পথ রচনা করছে। সর্বোপরি বিদ্যমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী এ পরিস্থিতিকে গুরুতর করে তোলার কারণ হবে।

পবিত্র কুর'আনে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু সুবর্ণ নীতি বর্ণনা করেছে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে লোভে শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। কখনো এটা নিজ ভৌগলিক সীমারেখার সম্প্রসারণে প্রকাশ পায়, আর কখনোবা প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ করায়ত্ত করার মধ্য দিয়ে, আর কখনো কেবলমাত্র অন্যের উপর নিজ আধিপত্যের নিদর্শন প্রকাশের উদ্দেশ্যে। এর ফলস্বরূপ নিষ্ঠুরতার ঘটনা ঘটে- তা নির্দয় স্বৈরশাসকদের হাতে হোক, যারা নিজ জনগণের অধিকার হরণ করে এবং নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে থাকে, বা কোন আগ্রাসী শক্তির হাতে যারা বাইরে থেকে দেশে প্রবেশ করে। কখনো, নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত মানুষের কান্নার রোল বহির্বিশ্বের কানেও গিয়ে পৌঁছে।

এতে যাই হোক না কেন, আমাদেরকে মহানবী (সা.) এ সোনালী শিক্ষা দিয়েছেন যে, অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী উভয়কে সাহায্য কর।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন যে, একদিকে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার বিষয়টি তো তারা বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু, অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে? মহানবী (সা.) উত্তরে বললেন, 'তার হাতকে অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত করার মাধ্যমে, কেননা অত্যাচারে সীমালঙ্ঘন তাকে খোদার শাস্তির পাত্র বানিয়ে দেয়।'* সুতরাং, তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তোমরা তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা কর। আমাদের সমাজের ক্ষুদ্রতম পরিসর (ব্যক্তি সত্ত্বা)-কে ছাড়িয়ে এ নীতি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে,

> **'এবং যদি মো'মেনদের দুই দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, তা হলে তাদের উভয়ের মধ্যে তোমরা মীমাংসা করাবে; যদি (মীমাংসার পরে) তাদের উভয়ের মধ্য হতে এক দল অপর দলের উপর বিদ্রোহ করে আক্রমণ করে তাহলে তোমরা সকলে মিলে যে বিদ্রোহ করেছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আল্লাহ্‌র নির্দেশের দিকে**

---

* সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইকরা, বাব ইয়ামীনির রাজুলি লি সাহিবিহী..., হাদীস নং ৬৯৫২

ফিরে আসে। যদি সে ফিরে আসে, তা হলে তোমরা উভয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। (৪৯:১০)

যদিও এ শিক্ষা মুসলমানদের সম্পর্কে, তবে এ নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে বিশ্বজনীন শান্তির ভিত্তি রচনা করা সম্ভব।

শুরুতেই বলা হয়েছে, শান্তি বজায় রাখার জন্য প্রথম শর্ত হল ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। আর যদি ন্যায় বিচারের নীতি অবলম্বন সত্ত্বেও শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহলে একতাবদ্ধ হও এবং সমবেতভাবে ঐ পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যারা সীমালঙ্ঘন করেছে এবং লড়তে থাকো যতক্ষণ না সেই সীমালঙ্ঘনকারী পক্ষ শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়। একবার যখন তারা শান্তি স্থাপনে প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন ন্যায়বিচারের দাবি হলঃ সেই অত্যাচারীর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখো, কিন্তু, এর পাশাপাশি তার অবস্থার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা কর।

আজ বিশ্বের কোন কোন দেশে বিদ্যমান অস্থিরতার অবসান করতে হলে- আর দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে বেশ কিছু মুসলিম দেশ অগ্রগণ্য- বিশেষ করে ভেটো প্রদানের ক্ষমতার অধিকারী দেশগুলোর বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করা উচিত যে, সেখানে সঠিকভাবে ন্যায়বিচার প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা। যখনই সাহায্যের প্রয়োজন হয়, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রতিই সাহায্যের আবেদন করা হয়।

যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, আমরা সাক্ষ্য দিই যে ব্রিটিশ সরকারের ইতিহাস এই যে, তারা সর্বদা ন্যায়কে সমুন্নত রেখেছে আর এ কারণেই আমি এ বিষয়গুলোর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।

আরেকটি নীতি যা বিশ্বে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের শেখানো হয়েছে তা হল অন্যের সম্পদের প্রতি লোভাতুর দৃষ্টি না দেয়া। পবিত্র কুর'আন বলে,

'আর আমরা তাদের মধ্য হতে কতক লোককে পার্থিব সৌন্দর্য্যের যা কিছু উপকরণ উপভোগ করতে দিয়েছি তার প্রতি তুমি লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাবে না। (কারণ এসব তাদের এ জন্য দেয়া হয়েছে) যেন আমরা তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করি'... (২০:১৩২)

নিজ জাতির জন্য আনুগত্য ও ভালোবাসার ইসলামি শিক্ষা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম - আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতাহু-আল্লাহ্‌তাআলার শান্তি ও রহমত আপনাদের সকলের উপর বর্ষিত হোক।

আমি প্রথমেই আপনাদের সদর দপ্তরে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আপনাদের মাঝে কিছু কথা বলার সুযোগ করে দেয়ার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হিসেবে আমি আপনাদের নিকট ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে চাই। তবে, এটি এত ব্যাপক একটি বিষয় যে কেবল একটি অনুষ্ঠানে বা সংক্ষিপ্ত সময়ে এর সম্পূর্ণ বর্ণনা সম্ভব নয়। তাই, এটা আবশ্যক যে আমি ইসলামের একটি দিক নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকি এবং আপনাদেরকে সে সম্পর্কে বলি।

ইসলামের কোন দিকটি নিয়ে আমি বক্তব্য রাখবো এ নিয়ে যখন চিন্তা করছিলাম, তখন এখানে জার্মানীতে আমাদের সম্প্রদায়ের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ ওয়াগিস হাউজার সাহেবের কাছ থেকে আমার কাছে একটা অনুরোধ আসে, যাতে তিনি আমাকে নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কীয় ইসলামী শিক্ষার উপর আলোচনা করতে অনুরোধ জানান। এটি আমাকে আমার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল। তাই, আমি এখন আপনাদের নিকট এ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার কিছু নির্দিষ্ট দিক সংক্ষেপে তুলে ধরবো।

'নিজ দেশের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা'-এই কথাগুলো বলতে বা শুনতে খুব সহজ মনে হয়। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে এই কয়েকটি শব্দের মাঝে অনেক ব্যাপক, সুন্দর ও সুগভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। আসলেই, এই শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ কী

এবং এর পূরণের জন্য কী দরকার তা পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবন করা সত্যিই বড় কঠিন। যাহোক, আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার উপর ইসলামী ধারণা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

সর্বাগ্রে উল্লেখ্য যে, ইসলামের একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে একজন ব্যক্তির কথা ও কাজে কোন প্রকারের দ্বৈততা বা কপটতা থাকা উচিত নয়। প্রকৃত বিশ্বস্ততার জন্য আন্তরিকতা ও সাধুতার উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এর জন্য দরকার একজন মানুষ বাইরে যা প্রকাশ করে অন্তরেও তার অবস্থা একই রকম যেন হয়। জাতীয়তার ক্ষেত্রে এই নীতিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য, যেকোন দেশের একজন নাগরিকের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে সে তার দেশের প্রতি প্রকৃত আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এক্ষেত্রে এটা কোন বিবেচ্য বিষয় না যে সে একজন জন্মগত নাগরিক কিংবা তার জীবনে পরবর্তীতে অভিবাসন বা অন্য কোন উপায়ে নাগরিকত্ব অর্জন করেছে কিনা।

বিশ্বস্ততা একটি মহৎ গুণ, আর যাঁরা এই গুণটি সর্বোচ্চ মাত্রায় এবং সর্বোত্তম মর্যাদায় প্রদর্শন করেছিলেন তারা হলেন আল্লাহ্‌র নবীগণ। খোদার সাথে তাদের ভালোবাসা এবং বন্ধন এত শক্তিশালী ছিল যে তারা সব ক্ষেত্রে যাই ঘটুক না কেন তাঁর আদেশকে সামনে রেখেছেন এবং তা পুরোপুরিভাবে পালনের প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এটি তাঁর প্রতি তাদের অঙ্গীকার এবং তাদের বিশ্বস্ততার নিখুঁত মানের পরিচয় বহন করে। তাই, তাদের বিশ্বস্ততার এই মানকে আমাদের উদাহরণ এবং আদর্শ হিসেবে নেওয়া উচিত। যাহোক, সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ‘বিশ্বস্ততা’-র আসল অর্থ কী তা বোঝা প্রয়োজন।

ইসলামি শিক্ষা অনুসারে, ‘বিশ্বস্ততা’-র সংজ্ঞা এবং প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সকল স্তরে এবং সর্বাবস্থায় যত কষ্টই হোক না কেন কারো অঙ্গীকার ও চুক্তিসমূহকে দ্ব্যর্থহীনভাবে পূর্ণ করা। বিশ্বস্ততার এই সত্যিকারের মান ইসলাম দাবি করে। পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদেরকে তাদের অঙ্গীকার ও চুক্তিকে অবশ্যই পূরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা তাদের দেয়া সকল প্রতিশ্রুতির জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদেরকে তাদের সকল অঙ্গীকার পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে নিজ নিজ গুরুত্ব অনুযায়ী অন্তর্ভূক্ত আছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকারসমূহ এবং অন্যান্য সকল অঙ্গীকার যাতে তারা আবদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে, মানুষের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যেহেতু মুসলমানেরা দাবি করে যে আল্লাহ্ এবং তাঁর ধর্ম তাদের নিকট সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ, তাই আল্লাহ্র প্রতি তাদের বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার প্রথমে অগ্রাধিকার পাবে, এবং খোদার প্রতি অঙ্গীকারকে তারা অন্য সকল কিছুর উপর মূল্য দিবে আর তা পূরণের জন্য তারা সংগ্রামে লিপ্ত থাকবে। সেজন্য এই বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে একজন মুসলমানের তার দেশের প্রতি যে বিশ্বস্ততা এবং দেশের আইনের প্রতি তার আনুগত্যের যে অঙ্গীকার তা কেবল তার জন্য গৌণ গুরুত্ব রাখে। তাই সে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে দেশের প্রতি তার অঙ্গীকারকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত থাকতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রথমতঃ আপনাদের জানাতে চাই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিজ জাতির প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। তাই আন্তরিক দেশপ্রেম ইসলামের একটি আবশ্যকীয়তা। আল্লাহ্ এবং ইসলামকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে চাইলে একজন ব্যক্তির নিজ দেশের প্রতিও ভালোবাসা রাখা দরকার। এটা তাই খুব সুস্পষ্ট যে কোন ব্যক্তির আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা এবং তার দেশের প্রতি ভালোবাসার মাঝে স্বার্থের কোন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে না। যেহেতু নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ইসলামের একটি অংশ করে নেয়া হয়েছে, তাই এটা সুস্পষ্ট যে একজন মুসলমানের তার বেছে নেওয়া দেশের প্রতি আনুগত্যের সর্বোচ্চ মান অর্জনের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটা খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর এবং তাঁর নিকটতর হওয়ার একটি মাধ্যম। তাই এটা অসম্ভব যে একজন সত্যিকারের মুসলমান খোদার প্রতি যে ভালোবাসা রাখে তা তার দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং সত্যিকারের ভালোবাসা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কখনো বাঁধা বা প্রতিবন্ধক সাব্যস্ত হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমরা কিছু দেশে দেখতে পাই যে সেখানে ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে এমনকি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হচ্ছে। তাই আরেকটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যেসকল লোক তাদের রাষ্ট্র কর্তৃক নির্যাতনের শিকার তারা কি তারপরও তাদের জাতি এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে? অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে পাকিস্তানে এরকম অবস্থা বিরাজমান যেখানে সরকার প্রকৃতপক্ষে আমাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আইন পাশ করেছে। এসকল আহমদী-বিরোধী আইন সেখানে কার্যকরীভাবে আরোপিত। এভাবে পাকিস্তানে, সকল আহমদী মুসলমানকে

সরকারীভাবে আইনের মাধ্যমে 'অমুসলমান' বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই তাদের জন্য সেখানে তাদের নিজেদেরকে 'মুসলমান' বলে দাবি করা নিষিদ্ধ। এছাড়া পাকিস্তানে আহমদীদের জন্য মুসলমানদের মতো করে ইবাদত করা নিষিদ্ধ বা এমন কোন ইসলামী অনুষ্ঠান বা প্রথা পালন করা নিষিদ্ধ যা তাদেরকে মুসলমান হিসেবে শনাক্ত করতে পারে। এভাবে পাকিস্তানে রাষ্ট্র নিজে থেকেই আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে ইবাদত করার মৌলিক মানবাধিকার হতে বঞ্চিত রেখেছে।

এই পরিস্থিতি সামনে রেখে এ প্রশ্নের উদয় হওয়া খুব স্বাভাবিক যে কিভাবে আহমদী মুসলমানরা এই অবস্থাতে দেশের আইন অনুসরণ করে? তারা কিভাবে তাদের দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে যেতে পারে? এখানে আমার এটা স্পষ্ট করা উচিত যে যেখানে এ ধরনের চরম পরিস্থিতি বিরাজমান সেখানে আইন এবং দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা দুইটি ভিন্ন বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয় যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের জন্য নির্ধারণ করে এবং ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি থাকা উচিত না। তাই যখন আইন এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে আসে, নিঃসন্দেহে এটা কঠিন নিষ্ঠুরতা এবং নির্যাতনের কাজ। বাস্তবে, এ ধরনের রাষ্ট্র-অনুমোদিত নির্যাতন, যা বিভিন্ন যুগে ঘটেছে, বেশীরভাগ মানুষের দ্বারা নিন্দিত হয়ে আসছে।

আমরা যদি ইউরোপের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই মহাদেশের লোকেরাও এধরনের ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছে, আর এর ফলে, বহু সহস্র লোককে এক দেশ থেকে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যেতে হয়েছে। সকল নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক, সরকার ও সাধারণ মানুষ একে নির্যাতন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর হিসেবে গণ্য করেছেন। এরকম পরিস্থিতিতে ইসলাম সমর্থন করে যে যেখানে নির্যাতন সকল সীমা অতিক্রম করে যায় এবং অসহনীয় হয়ে পড়ে তখন সে সময়ে একজন ব্যক্তির উচিত সেই শহর বা দেশ ত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থানে চলে যাওয়া যেখানে সে শান্তিপূর্ণভাবে তার ধর্ম পালন করতে স্বাধীন। তবে, এ পথনির্দেশনার পাশাপাশি, ইসলাম এটিও শিক্ষা দেয় যে কারো কোন অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া উচিত না এবং না তার উচিত তার দেশের বিরুদ্ধে কোন পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়া। এটা ইসলাম প্রদত্ত একটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ।

চরম নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ আহমদী পাকিস্তানে বাস করে চলেছে। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরূপ চলমান বৈষম্য এবং নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, তারা দেশের সাথে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সত্যিকারের আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। যেখানেই তারা কর্মরত থাকুক না কেন বা যেখানেই তারা অবস্থান করুক না কেন, তারা জাতির উন্নয়ন এবং সাফল্যে সাহায্যের চেষ্টায় অবিরতভাবে নিয়োজিত। কয়েক দশক ধরে, আহমদীয়াতের বিরোধীরা এই অভিযোগের চেষ্টা করে আসছে যে আহমদীরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত নয়, কিন্তু তারা কখনো এটা প্রমাণ করতে পারে নি বা তাদের দাবির সমর্থনে কোন দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে নি। বরং, সত্য হচ্ছে যখনই পাকিস্তানের জন্য, তাদের দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হয়েছে, আহমদী মুসলমানেরা সব সময় সামনের সারিতে দাঁড়িয়েছে এবং দেশের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়েছে।

নিজেরা আইনের শিকার এবং লক্ষ্য হওয়া সত্ত্বেও আহমদী মুসলমানেরাই অন্য যে কারো চেয়ে ভালোভাবে দেশের আইন অনুসরণ করে এবং মেনে চলে। এর কারণ হচ্ছে তারা সত্যিকারের মুসলমান, সত্যিকারের ইসলাম তারা অনুসরণ করে। বিশ্বস্ততা সম্পর্কে পবিত্র কুর'আন প্রদত্ত আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে মানুষের সে সকল জিনিস থেকে দূরে থাকা উচিত যা অশোভন, অবাঞ্ছিত এবং যা যেকোন প্রকারের বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। ইসলামের একটি সুন্দর ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি পরিণতির চূড়ান্ত বিন্দু, যেখানে ফলাফল অত্যন্ত বিপজ্জনক, কেবল তার প্রতিই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে না; বরং, এটা আমাদেরকে প্রতিটি ছোট বিষয় সম্পর্কেও সতর্ক করে, যা প্রাথমিক ধাপ হিসেবে কাজ করে মানবজাতিকে বিপদ-সংকূল পথে চালিত করে। তাই, ইসলামের নির্দেশনা যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায়, তাহলে যেকোন বিষয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে এর গোড়াতেই সমাধান করা সম্ভব।

উদাহরণস্বরূপ, একটা বিষয় যা দেশের চরমভাবে ক্ষতি করতে পারে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অর্থনৈতিক লোভ-লালসা। প্রায়শঃই মানুষ পার্থিব আকাঙ্ক্ষার কবলে পড়ে যায় যা ক্রমান্বয়ে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় আর এরকম বাসনা তাদেরকে পরিণামে অবাধ্য আচরণের পথে পরিচালিত করে। এভাবে এই বিষয়গুলো চূড়ান্তভাবে নিজ দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার কারণ হতে পারে। এর কিছুটা ব্যাখ্যা আমি করে নেই। আরবীতে মানুষের সে সকল কর্মকাণ্ডের

বর্ণনা দেয়ার জন্য 'বাগা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা তাদের দেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। এটা তাদেরকে বুঝায় যারা ভুল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে বা যারা অন্যদের ক্ষতি করে। এতে তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা জালিয়াতি করে এবং অবৈধ বা অন্যায় উপায়ে কিছু অর্জনের চেষ্টা করে। এটা তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা সব সীমা অতিক্রম করে এবং ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হয়। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে যে সকল লোক এরূপ কাজ করে তাদের কাছ থেকে বিশ্বস্ততার আচরণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে না, কেননা বিশ্বস্ততা উঁচু মাপের নৈতিক গুণাবলীর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। উচ্চ নৈতিক মান ছাড়া বিশ্বস্ততা থাকতে পারে না আর বিশ্বস্ততা ছাড়া উচ্চ নৈতিক মান থাকতে পারে না। যদিও এটা সত্য যে উঁচু নৈতিক মান সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, কিন্তু, ইসলাম ধর্মে এটি আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকে ঘিরেই আবর্তন করে। তাই, মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সবসময় এমনভাবে কাজ করার যা তাঁর সন্তুষ্টির কারণ হয়। সংক্ষেপে, ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী সর্বশক্তিমান খোদা সকল প্রকারের বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহকে নিষেধ করেছেন, তা নিজ দেশের বিরুদ্ধেই হোক বা নিজ সরকারের বিরুদ্ধেই হোক। এর কারণ হচ্ছে বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কাজ করা জাতির শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, যেখানে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বিরোধিতা চলে, সেখানে সেটা আন্তর্জাতিক শত্রুতার আগুনকেও উস্‌কে দেয় এবং বহিরাগতদেরকে আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার সুবিধা নিতে উৎসাহিত করে। তাই, নিজ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল বহুদূর প্রসারিত এবং মারাত্মক হতে পারে। এভাবে, যা কিছু জাতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে তা সেই 'বাগা' শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত যার আলোচনা আমি করেছি। এ সমস্ত কিছু মনে রেখে, নিজ জাতির প্রতি আনুগত্যের জন্য একজনের ধৈর্য্য প্রদর্শনের, নৈতিকতা দেখানোর এবং দেশের আইন অনুসরণের প্রয়োজন।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আধুনিক যুগে, অধিকাংশ সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে চালিত হয়। তাই কোন ব্যক্তি বা দল যদি সরকার পরিবর্তনের ইচ্ছা রাখে, তাহলে তাদের উচিৎ যথাযথ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে তা করা। তাদের নিজেদের আওয়াজ ব্যালট বাক্সে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে শুনানো উচিত। ব্যক্তিগত পছন্দ বা ব্যাক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে ভোট দেয়া উচিত না, বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শিক্ষা দেয় যে দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসার এক

প্রেরণা নিয়ে নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত। জাতির উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে নিজ ভোট প্রদান করা উচিত। সেজন্য, কারো নিজস্ব প্রয়োজনের দিকে বা কোন্ প্রার্থী বা দলের নিকট হতে ব্যক্তিগত লাভবান হওয়া যাবে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়; বরং, একজন ব্যক্তির ভারসাম্যপূর্ণভাবে তার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যেখানে সে মূল্যায়ন করে কোন প্রার্থী বা দল সমগ্র জাতির উন্নয়নে সহায়ক হবে। সরকারের চাবি-কাঠি একটি বড় আমানত এবং তাই এর হস্তান্তর শুধু সেই দলের কাছেই করা উচিত যাকে ভোটার সত্য-সত্যই সবচেয়ে বেশি উপযোগী এবং যোগ্য মনে করে। এটাই প্রকৃত ইসলাম এবং এটাই প্রকৃত বিশ্বস্ততা।

বাস্তবিকই আল্লাহ্‌তাআলা পবিত্র কুর'আনের সুরা ৪, আয়াত ৫৯-এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, কারো পক্ষে আমানতকে কেবল এর উপযুক্ত প্রাপকের নিকট অর্পণ করা উচিত এবং মানুষের মাঝে বিচার করার সময় ন্যায় এবং সততার সাথে ফয়সালা করা উচিত। তাই, নিজ জাতির প্রতি বিশ্বস্ততার দাবি হচ্ছে যে, সরকারের ক্ষমতা তাদের নিকট অর্পণ করা উচিত যারা এর সত্যিকারের প্রাপ্য, যাতে করে জাতি উন্নতি করতে পারে এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতির মাঝে সামনের সারিতে এসে দাঁড়াতে পারে।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে আমরা দেখতে পাই যে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণ ধর্মঘট ও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে। উপরন্তু, তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে, প্রতিবাদকারীরা রাষ্ট্রের বা বেসরকারী জনগণের সম্পত্তি ও সম্পদের লুট-পাট বা ক্ষতিসাধন করে। যদিও তারা দাবি করে যে এই ধরনের কর্মকাণ্ড তারা ভালোবাসার টানে করছে, কিন্তু সত্য হলো যে এ ধরনের কাজের সাথে আনুগত্য বা দেশপ্রেমের কোন সম্পর্ক নেই। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, এমনকি যদি প্রতিবাদ বা ধর্মঘট কোন প্রকার অপরাধমূলক ধ্বংসযজ্ঞ বা সহিংসতা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়, তারপরও এর একটা গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে। কেননা প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ হলেও, এর কারণে জাতির অর্থনীতিতে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। কোন অবস্থাতেই এধরনের আচরণ জাতির প্রতি বিশ্বস্ততার উদাহরণ হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে না। একটি সুবর্ণ নীতি যা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা শিখিয়েছেন তা হলো সব সময় আমাদের আল্লাহ্‌তাআলা, নবীগণ এবং আমাদের দেশের শাসকদের প্রতি অনুগত থাকা উচিত। এই একই শিক্ষা পবিত্র কুর'আনে দেয়া হয়েছে। তাই, এমনকি যেখানে কোন দেশ ধর্মঘট বা প্রতিবাদ করার অনুমতি দেয়, সেখানে এই কর্মকাণ্ড শুধু

সেই মাত্রা পর্যন্ত পরিচালনা করা উচিত যার কারণে জাতির বা অর্থনীতির কোন ক্ষয়-ক্ষতি না হয়।

আরেকটি প্রশ্ন প্রায়ই উত্থিত হয় যে মুসলমানেরা পশ্চিমা দেশসমূহের সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে পারে কিনা, আর যদি যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে তারা মুসলমান দেশের উপর সামরিক আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে পারে কিনা? ইসলামের একটি অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে কোন ব্যক্তির নিষ্ঠুরতার কাজে সাহায্য করা উচিত না। এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ যেকোন মুসলমানের চিন্তার সম্মুখে সবসময় থাকা উচিত। যখন একটি মুসলমান দেশ এ কারণে আক্রান্ত হয় যে, দেশটি নিজে থেকে নিষ্ঠুর ও অন্যায় পথে পরিচালিত হচ্ছিল এবং সে প্রথমে আগ্রাসী হয়েছিল, তখন এ রকম পরিস্থিতিতে কুর'আন মুসলমান সরকারদেরকে নির্দেশ দেয় যে তার অত্যাচারী হাত তাদের থামানো উচিত। এর অর্থ তাদের নিষ্ঠুরতা বন্ধ করা উচিত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। তাই, এরূপ পরিস্থিতিতে নিষ্ঠুরতার ইতি টানার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ অনুমতিদানের যোগ্য। তবে, সেই সীমালংঘনকারী জাতি যদি নিজেদের শুধরায় এবং শান্তির পথ বেছে নেয়, তাহলে প্রতারণা বা মিথ্যা অজুহাতে সেই দেশ বা তার জনগণের অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করা উচিত নয় বা তাদেরকে অধীন করে রাখা উচিত নয়। বরং তাদেরকে পুনরায় তাদের স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তাই কোন কায়েমি স্বার্থ পূরণ না করে বরং শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই সামরিক অভিযানের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

একইভাবে, ইসলাম মুসলমান বা অমুসলমান সকল দেশকে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার বন্ধের অধিকার প্রদান করেছে। তাই, প্রয়োজন হলে, কোন অমুসলমান দেশ এসকল খাঁটি লক্ষ্য অর্জনে মুসলমান দেশ আক্রমণ করতে পারে। সেসকল অমুসলমান দেশের মুসলমানেরা তাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে পারে এবং অন্য দেশকে নিষ্ঠুরতা থেকে প্রতিহত করতে পারে। যেখানে এরকম পরিস্থিতি সত্যিকার অর্থে বিদ্যমান তখন মুসলমান সৈন্যরা যেকোন পশ্চিমা সৈন্যবাহিনীর অংশই হোক না কেন, তাদের আদেশ পালন করা উচিত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যদি দরকার হয় তাহলে যুদ্ধ করা উচিত। তবে যদি কোন সৈন্যবাহিনী অন্যায়ভাবে অন্য কোন জাতিকে আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এভাবে অত্যাচারী হয়ে যায়, তখন একজন মুসলমানের সৈন্যবাহিনী ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আছে, কারণ অন্যথায় তাহলে সে নিষ্ঠুরতার সাহায্যকারী হয়ে যাবে।

এই সিদ্ধান্ত নেয়ার অর্থ এ নয় যে সে তার দেশের অবাধ্য হচ্ছে। আসলে, এরকম পরিস্থিতিতে দেশের প্রতি তার বিশ্বস্ততাই এ দাবি করে যে, সে এরকম পদক্ষেপ নেয় এবং নিজের সরকারকে পরামর্শ দেয় যেন তারা সেই সকল অন্যায্য সরকার ও জাতি যারা নিষ্ঠুরভাবে কাজ করে তাদের ন্যায় অধঃপতিত হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে। তবে যদি সৈন্যবাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক হয় এবং ছেড়ে আসার কোন পথ না থাকে, কিন্তু তার বিবেকও সায় না দেয়, তাহলে সেই মুসলমানের দেশ ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু সেই দেশের আইনের বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তোলার তার কোন অনুমতি নেই। তার দেশ ছাড়া উচিত কারণ একজন মুসলমান একটি দেশের নাগরিক হিসেবে বাস করতে পারে না যখন একই সময়ে সে সেই দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে বা প্রতিপক্ষের সাথে হাত মিলায়।

তাই এগুলো হচ্ছে ইসলামী শিক্ষার কেবল কিছু দিক, যা সকল খাঁটি মুসলমানকে নিজ দেশের জন্য আনুগত্য ও দেশপ্রেমের প্রকৃত দাবি পূরনের দিকে পরিচালিত করে। যেটুকু সময় ছিল তাতে আমি এই বিষয়ের উপর সংক্ষেপে কিছু বলতে পেরেছি মাত্র।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে আজকের দিনে আমরা দেখতে পাই সারা পৃথিবী এক বিশ্বপল্লীতে পরিণত হয়েছে। মানবজাতি একে অপরের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। সকল দেশে সকল জাতি, ধর্ম এবং সংস্কৃতির লোকদের পাওয়া যায়। এজন্য সকল দেশের নেতৃবৃন্দের উচিত সকল মানুষের অনুভূতি এবং ভাবাবেগকে বিবেচনায় রাখা এবং শ্রদ্ধা করা। নেতৃবর্গ এবং তাদের সরকারের উচিত মানুষের মাঝে মনোকষ্ট ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে এমন আইন তৈরি না করে এমন আইন প্রণয়নের চেষ্টা করা যা সত্য ও ন্যায়বিচারের এক পরিবেশ ও প্রেরণার লালন করে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতাকে নির্মূল করা উচিত এবং এর স্থলে সত্যিকারের ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে সারা বিশ্ব যদি এর সৃষ্টিকর্তাকে চিনে নেয়। সকল প্রকারের বিশ্বস্ততাকে খোদাতাআলার প্রতি বিশ্বস্ততার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা উচিত। যদি এরূপ হয় তাহলে আমরা নিজের চোখে দেখতে পাবো যে সকল দেশের জনগণ দ্বারা অনেক উঁচু মানের আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সারা বিশ্বে আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে পরিচালনাকারী নতুন পথের উন্মোচন হবে।

শেষ করার আগে, এ সুযোগে আপনাদের সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং আমার কথা শুনার জন্য। আল্লাহ্ আপনাদের সকলের কল্যাণ করুন এবং জার্মানীর কল্যাণ করুন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি
এবং নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

৯ম বার্ষিক শান্তি সম্মেলন

লন্ডন, যুক্তরাজ্য, ২০১২
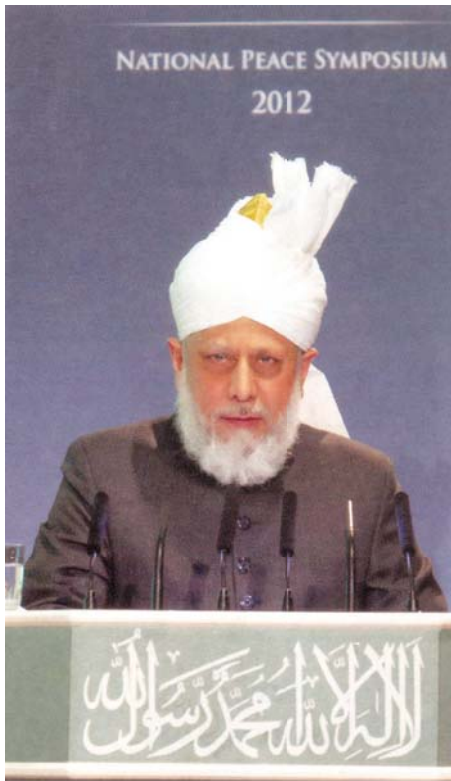
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.)
৯ম বার্ষিক শান্তি সম্মিলনে ভাষণ দিচ্ছেন

হুযূর (আই.)-কে লন্ডন বাস সুভ্যেনীর প্রদানরত
লন্ডনের মেয়র বরিস জনসন

হুযূর (আই.)-এর কাছ থেকে 'আহমদীয়া মুসলিম প্রাইজ
ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব পিস' গ্রহণ করছেন এসওএস
চিলড্রেন ভিলেজেস-এর যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট
ডেম মেরী রিচার্ডসন ডিবিই

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.)
বৈদেশিক পাকিস্তানী প্রেসের সাথে বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছেন

পটভূমি

২৪শে মার্চ, ২০১২ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাজ্যের আয়োজনে পশ্চিম ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদ মর্ডেনের বাইতুল ফুতূহ মসজিদে ৯ম বার্ষিক শান্তি সম্মেলন (পীস সিম্পোজিয়াম) অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য, লন্ডনের মেয়র, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পেশাজীবী, প্রতিবেশী এবং সর্বস্তরের অতিথিবৃন্দ সহ সহস্রাধিক দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এ বছরের সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল 'আন্তর্জাতিক শান্তি'। এ ছাড়াও এ অনুষ্ঠানে বিশ্বজুড়ে এতীম ও পরিত্যক্ত শিশুদের দুর্ভোগ লাঘবে ও 'প্রত্যেক শিশুর জন্য একটি স্নেহশীল নীড়'-এর স্বপ্ন পূরণে তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'এস.ও.এস. শিশু পল্লী, যুক্তরাজ্য'-কে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর হাতে ৩য় বার্ষিক 'আহমদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন:

- রাইট অনারেবল জাস্টিন গ্রীনিং- এম.পি., পরিবহন প্রতিমন্ত্রী
- জেন এলিসন- এম.পি. (ব্যাটারসী)
- সীমা মালহোত্রা- এম.পি. (ফেল্টহাম ও হেস্টন)
- টম ব্রেক- এম.পি. (কার্লসহাল্টন ও ওয়ালিংটন)
- বীরেন্দ্র শর্মা- এম.পি. (ঈলিং ও সাউথহল)
- লর্ড তারিক আহমদ অব উইম্বলডন
- হিজ এক্সিলেন্সী ওয়েসলি মোমো জনসন- লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রদূত
- হিজ এক্সিলেন্সী আব্দুল্লাহ আল রাযী- ইয়েমেনের রাষ্ট্রদূত
- হিজ এক্সিলেন্সী মিগুয়েল সোলানো-লোপেজ- প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রদূত
- কমোডোর মার্টিন আথারটন- আঞ্চলিক কমান্ডার, ব্রিটিশ নৌবাহিনী
- কাউন্সিলর জেন কূপার- মেয়র, ওয়ান্ড্সওয়ার্থ
- কাউন্সিলর মিল্টন ম্যাককেন্যী এম.বি.ই.- মেয়র, বার্কিং এ্যান্ড ডাগেনহাম
- কাউন্সিলর অমৃত মান- মেয়র, হাউন্সলো
- সিওবহান বেনিটা- স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী, লন্ডন
- ভারত, ক্যানাডা, ইন্দোনেশিয়া, গিনি সহ বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিকবৃন্দ

পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি এবং নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা

তাশাহুদ, তা'উয ও বিসমিল্লাহ পাঠের পর খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) বলেন:

সমবেত সকল অতিথিবৃন্দ! আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু- আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

আজ, এক বছরের ব্যবধানে, এ অনুষ্ঠানে আমাদের সকল বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানানোর সুযোগ হচ্ছে। আমি আপনাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ যে, আপনারা সময় বের করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

বস্তুত: আপনাদের অধিকাংশই এ অনুষ্ঠানের সাথে পরিচিত যা ধীরে ধীরে 'পীস সিম্পোজিয়াম' (শান্তি সম্মেলন) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রতি বছর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে আর এটি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে আমাদের বিভিন্ন চেষ্টার একটি।

আজকের উপস্থিতির মধ্যে এমন কিছু নতুন বন্ধুও রয়েছেন যারা প্রথমবারের মত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন, আর বাকিরা পুরনো বন্ধু যারা বহু বছর ধরে আমাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন দিয়ে আসছেন। নতুন হন বা পুরনো, আপনারা সকলেই শিক্ষিত সমাজের অংশ এ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে আপনারা নিজেরাও ধারণ করেন, আর এ আকাঙ্ক্ষার কারণেই আজ আপনারা এ অনুষ্ঠানে যোগদান করছেন।

আপনারা সকলেই আজ এ হৃদয়-নিংড়ানো বাসনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন যে, পৃথিবী যেন ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যে ভরে যায়। এটিই সেই দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ যার প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ব্যাকুল দৃষ্টি এবং যা এ বিশ্বের জন্য আবশ্যক। অতএব, এ উদ্দেশ্যেই আপনারা সকলে যারা ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি, জাতি ও ধর্ম থেকে এসেছেন, আজ আমার সামনে উপস্থিত।

যেভাবে আমি বলেছি, আমরা প্রতি বছর এ সম্মেলনের আয়োজন করে থাকি আর প্রতি বার এ একই অনুভূতি ও প্রত্যাশা আমরা সবাই ব্যক্ত করি যে, আমাদের চোখের সামনে যেন বিশ্বে শান্তি আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি; আর এজন্যই প্রতি বছর আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করি যেন যেখানেই আপনাদের সুযোগ আছে আর যার সাথেই যোগাযোগ আছে, সেখানে আপনারা যেন শান্তির পক্ষে কাজ করেন। তদুপরি আমি তাঁদের সকলকে অনুরোধ করি, যারা রাজনৈতিক দল বা সরকারের সাথে সম্পর্ক রাখেন যে, তাঁদের নিজস্ব প্রভাবের গণ্ডীর মাঝে তারা যেন এ শান্তির বাণী পৌঁছে দেন। এটি আবশ্যক যে সকলকে এ বিষয়ে সচেতন করা হয় যে, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের যে কোন সময় অপেক্ষা আজ উচ্চ ও পরিশীলিত নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজন অনেক বেশি।

যত দূর পর্যন্ত আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সম্পর্ক যেখানেই এবং যখনই সুযোগ পাওয়া যায়, আমরা আমাদের অভিমত স্পষ্টভাবে প্রকাশ ও ঘোষণা করি যে, বিশ্ব আজ যে ধ্বংসযজ্ঞ ও সর্বনাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে তা থেকে একে রক্ষা করার একটিই উপায়, আর তা এই যে, আমাদের সকলকে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের অনুভূতির বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি, বিশ্বকে তার স্রষ্টাকে চিনতে হবে, যিনি এক-অদ্বিতীয় খোদা। কেননা স্রষ্টাকে চেনাই হল সেই বিষয় যা আমাদেরকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতির দিকে নিয়ে যায়; আর যখন এটি আমাদের স্বভাবের অংশ হয়ে যায়, তখনই আমরা খোদাতা'লার ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হই।

আমরা সর্বদা এ আওয়াজ উঠাচ্ছি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আমরা আমাদের অন্তরে যে বেদনা ও অস্থিরতা অনুভব করি তা আমাদেরকে মানবজাতির কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করতে, আর আমাদের বসবাসের এ পৃথিবীকে আরো সুন্দর করতে প্রয়াসী হতে অনুপ্রাণিত করে। বস্তুত: আজকের এ অনুষ্ঠানটি এ উদ্দেশ্যে হাতে নেয়া আমাদের অনেক কর্মসূচীর অন্যতম।

যেভাবে আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, আপনারা সকলেও এ মহৎ আকাঙ্ক্ষা রাখেন। উপরন্তু, আমি বারংবার রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতাদেরকে শান্তির জন্য সংগ্রাম করতে আহ্বান করেছি। কিন্তু, এ সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, আমরা দেখি যে, আজ বিশ্ব জুড়ে উৎকণ্ঠা ও গোলযোগ ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে ও বেড়েই চলেছে। আজকের জীবনে আমরা বড় বেশি বিবাদ, অস্থিরতা ও বিশৃংখলা দেখে থাকি।

কোন দেশে জনগণই একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছে, বা এর বিপরীতে শাসক গোষ্ঠিই নিজ দেশের মানুষের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। সন্ত্রাসী চক্র নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য অরাজকতা ও বিশৃংখলায় ইন্ধন যোগাচ্ছে, আর তারা নির্বিচারে নিরীহ নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করছে। কোন কোন দেশে রাজনৈতিক দলগুলো দেশের উন্নতির লক্ষ্যে সমবেতভাবে কাজ করার পরিবর্তে নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষায় একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত আছে। আমরা এও দেখি যে কোন কোন সরকার ও দেশ ক্রমাগতভাবে অন্য দেশের সম্পদের দিকে ঈর্ষার সাথে দৃষ্টিপাত করে চলেছে। বিশ্বের শীর্ষ শক্তিগুলো নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখার প্রচেষ্টাতেই মগ্ন, আর এ পথে তাদের প্রচেষ্টায় তারা কোন প্রকারে ছাড় দিচ্ছে না।

এসব কিছু মাথায় রেখে, আমরা অনুভব করি যে না আহমদীয়া সম্প্রদায়, আর না আপনাদের অধিকাংশ, যারা জনগণেরই অংশ-এর এ ক্ষমতা বা শক্তি আছে যে এমন নীতিসমূহ গড়ে তুলি যা ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে। কেননা আমরা কোন সরকারী ক্ষমতা বা পদে আসীন নই। বরং, আমি এত দূর বলতে পারি যে, সেই সকল রাজনীতিবিদ, যাদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে আর যারা যখন আমাদের সান্নিধ্যে থাকেন তখন সব সময় আমাদের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করে থাকেন, তারাও উচ্চবাচ্য করতে অসমর্থ হন। বরং এর বিপরীতে তাদের কণ্ঠস্বর অন্যের ভীড়ে হারিয়ে যায় আর তাদেরকে নিজ অভিমত (যথাযথ গুরুত্বের সাথে) উপস্থাপন করতে দেয়া হয় না। এটা কখনো এ কারণে যে তারা দলীয় নীতির অনুসরণ করতে বাধ্য, বা কখনো বিশ্বের অন্যান্য শক্তি বা রাজনৈতিক মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে বৈদেশিক চাপে যা তাদেরকে দাবিয়ে রেখে চলেছে।

তথাপি, আমরা, যারা প্রতি বছর এ 'পীস সিম্পোজিয়াম'-এ অংশ নিয়ে থাকি, নিঃসন্দেহে এ আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করি যে শান্তি যেন প্রতিষ্ঠিত হয় আর আমরা নিশ্চিতভাবেই আমাদের এ মত এবং অনুভূতি প্রকাশ করি যে সকল ধর্ম, সকল জাতি, সকল গোত্র, বস্তুতঃ সকল মানুষের মধ্যে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদিও এ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার শক্তি আমরা রাখি না। সেই ফলাফল, যা আমাদের অভীষ্ট, তা অর্জন করার কর্তৃত্ব বা শাক্তি আমাদের নেই।

আমার স্মরণ আছে, বছর দুয়েক আগে, এ হলঘরেই আমাদের 'পীস সিম্পোজিয়াম'-এর সময়, আমি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ ও উপায় বিশদভাবে আলোচনা করে একটি বক্তৃতা করেছিলাম, আর আমি এও বর্ণনা করেছিলাম যে জাতিসংঘের কার্যধারা কিরূপ হওয়া উচিত। এরপর আমাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং সম্মানিত লর্ড এরিক এভবারী এ মন্তব্য করেছিলেন যে, এ বক্তৃতা খোদ জাতিসংঘে প্রদান করার প্রয়োজন ছিল। যাহোক, এটি তাঁর মহৎ চরিত্রের পরিচয় বহন করে যে তিনি তাঁর মন্তব্য করতে গিয়ে এতটা ঔদার্য্য ও বিনয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, আমি যা বলতে চাই তা এই যে, কেবল একটি বক্তৃতা করা বা শোনা যথেষ্ট না আর এর ফলে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে না। বস্তুত: এ মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের মূল চাহিদা হল পরিপূর্ণ ন্যায় ও সকল বিষয়ে পক্ষপাতহীনতা। পবিত্র কুর'আনের সূরা ৪: আয়াত ১৩৬-এ বিষয়ে আমাদের সামনে এক সোনালী নীতি ও শিক্ষা পেশ করেছে। এখানে বলা হয়েছে যে ন্যায়ের দাবি পূরণ করতে গিয়ে, এমনকি যদি আপনাকে নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, বা নিজ পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীয়ের ও বন্ধুর, তবু আপনাকে অবশ্যই তাই করতে হবে। এটিই হল প্রকৃত ন্যায় যেখানে সার্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যক্তি স্বার্থকে পরিত্যাগ করা হয়।

যদি আমরা সমষ্টিগত পর্যায়ে এ নীতির বিষয়ে চিন্তা করি তাহলে আমরা উপলব্ধী করি যে, সম্পদ ও প্রভাবের বিচারে অন্যায়ভাবে কারো পক্ষে লবিং করার কূটকৌশল পরিত্যাগ করা উচিত। এর স্থলে আন্তরিকতার সাথে এবং ন্যায় ও সাম্যের নীতি সমর্থন করার প্রয়াসে সকল দেশের প্রতিনিধিবর্গ ও রাষ্ট্রদূতগণের এগিয়ে আসা উচিত। সর্ব প্রকার পক্ষপাতদুষ্টতা ও বৈষম্য আমাদেরকে নির্মূল করতে হবে, কেননা এটিই শান্তি বয়ে আনার একমাত্র মাধ্যম। যদি আমরা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের দিকে তাকাই, আমরা দেখি যে অনেক সময় সেখানে প্রদত্ত বিবৃতি বা বক্তৃতা ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু, এ প্রশংসাসমূহ অর্থহীন, কেননা প্রকৃত সিদ্ধান্ত যা হওয়ার তা পূর্বনির্ধারিত হয়েই রয়েছে।

অতএব যখন সিদ্ধান্ত সমূহ ন্যায় ও সত্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বদলে, বড় বড় শক্তির চাপ বা লবির ভিত্তিতে গৃহিত হয় তখন এসব বক্তৃতা অর্থহীন, ফাঁকা বুলি সাব্যস্ত হয়, আর কেবল বাইরের জগতকে বিভ্রান্তকারী ছলনা হিসেবে কাজ করে। যাহোক, এসবের অর্থ এ নয় যে, আমরা কেবল আশাহত হয়ে বসে থাকবো আর আমাদের সকল চেষ্টাকে পরিত্যাগ করবো। বরং এর বিপরীতে, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, দেশের আইনের অধীনে থেকে, সবসময়

সরকারকে যুগের চাহিদা সম্পর্কে স্মরণ করাতে থাকবো। আর সেই সকল গোষ্ঠি যাদের স্বার্থ এতে সংশ্লিষ্ট আছে তাদেরকেও যথাযথ পরামর্শ আমাদেরকে প্রদান করতে হবে, যেন বৈশ্বিক পর্যায়ে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কেবল তখনই আমরা বিশ্বকে সেই শান্তি ও সম্প্রীতির নীড়ে পরিণত হতে দেখবো যার কামনা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের সবার।

সুতরাং, আমরা আমাদের প্রচেষ্টাসমূহ পরিত্যাগ করবো না আর কখনো তা করা উচিত হবে না। যদি নিষ্ঠুরতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের আওয়াজ উত্তোলন বন্ধ করি তবে আমরা তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো যাদের একেবারেই কোন মূল্যবোধ বা নৈতিক মান নেই। আমাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাক বা না যাক, আর প্রভাব রাখুক বা না রাখুক, অন্যদেরকে শান্তির পথে আমাদেরকে আহ্বান করে যেতেই হবে। আমি সবসময় অত্যন্ত আনন্দিত হই যখন দেখি যে, ধর্ম ও জাতির ভিন্নতা সত্ত্বেও, মানবীয় মূল্যবোধকে উড্ডীন রাখার লক্ষ্যে এত মানুষ বিশ্বে শান্তি ও সহানুভূতি প্রতিষ্ঠার পথসমূহ সম্পর্কে শোনার, শেখার ও আলোচনা করতে এ অনুষ্ঠানে সমবেত হন। তাই আমি আপনাদের সকলকে আহ্বান করছি যেন নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করে যাই এবং আশা সেই স্ফুলিঙ্গকে জীবিত রাখি যে, এক দিন সেই সময় আসবে যখন সারা বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন মানবীয় প্রচেষ্টাসমূহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন সর্বশক্তিমান খোদা মানবজাতির পরিণাম সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এর পূর্বে যে খোদাতাআলার সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে শুরু করে আর মানবজাতিকে তাঁর দিকে এবং মানবজাতির অধিকার আদায়ের দিকে যেতে বাধ্য করে, অনেক মঙ্গলজনক হয় বিশ্বের মানুষ নিজেই এ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি সচেতন হয়, কেননা যখন সর্বশক্তিমান খোদা হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন তখন তাঁর প্রতাপান্বিত রোষ মানবজাতির উপর ভয়াবহ প্রলয়ঙ্করী রূপে আপতিত হয়।

আজকের পৃথিবীতে, খোদাতাআলার ফয়সালার এক ভীতিপ্রদ বহিঃপ্রকাশ হতে পারে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এরূপ এক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ কেবল বর্তমান প্রজন্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বস্তুত:, এর ভয়াবহ পরিণামসমূহ আগত প্রজন্মান্তরে প্রকাশিত হবে। এরকম এক যুদ্ধের বহুবিধ করুণ পরিণতির কেবল একটি হল, কেবল বর্তমান নয়, বরং ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের উপর এর প্রভাব। আজ যেসব মারণাস্ত্র রয়েছে সেগুলো

এত ধ্বংসাত্মক যে এর ফলস্বরূপ প্রজন্মান্তরে শিশুরা মারাত্মক জেনেটিক ও শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্ম লাভের আশংকা রয়েছে।

জাপান সেই একক দেশ যা পারমাণবিক যুদ্ধের বীভৎস পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একে নিউক্লিয়ার বোমা দ্বারা আক্রমণ করা হয়। এমনকি আজও যদি আপনি জাপান সফর করেন এবং এর জনগণের সাথে কথা বলেন, তবে তাদের চোখে-মুখে যুদ্ধের প্রতি তীব্র এক আতঙ্ক ও ঘৃণা আপনি দেখতে পাবেন। অথচ যে নিউক্লিয়ার বোমাগুলো সে সময় ব্যবহৃত হয়েছিল আর যা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়েছিল, তা আজকের দিনের ছোট ছোট রাষ্ট্রের হাতেও যে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

বলা হয় যে জাপানে, যদিও ইতোমধ্যে সাতটি দশক অতিবাহিত হয়েছে, আজও নবজাতক শিশুদের মধ্যে পারমাণবিক বোমাগুলোর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। যদি কাউকে গুলিও করা হয়, তবু কখনো চিকিৎসার ফলে তাঁর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু, যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে যারা আক্রমণের মুখে পড়বে তাদের এমন কোন সুযোগ থাকবে না। বরং আমরা দেখবো যে মানুষ সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করবে আর মূর্তির মত স্থির হয়ে জমে যাবে, আর তাদের ত্বক আস্তে আস্তে গলে পড়বে। পানীয় জল, খাদ্য, ফসলাদি সবকিছু তেজস্ক্রীয়তা দ্বারা আক্রান্ত হবে। এর বিষক্রিয়ায় কি ধরনের রোগের উদ্ভব হবে, আমরা কেবল তার কল্পনা করতে পারি। ঐ সকল স্থান যেখানে সরাসরি আঘাত হবে না আর যেখানে তেজস্ক্রীয়তার পরিমাণ কিছু কম হবে, এমনকি সেখানেও অসুখ-বিসুখের ঝুঁকি বেড়ে যাবে আর পরবর্তী প্রজন্মগুলোও অনেক বাড়তি ঝুঁকি বহন করবে।

সুতরাং যেভাবে আমি বলেছি, এমন যুদ্ধের ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব কেবল সেই যুদ্ধও নিকট ভবিষ্যতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এটি প্রবহমান থাকবে। এই হল এমন এক যুদ্ধের প্রকৃত পরিণাম; আর এতদ্‌সত্ত্বেও এমন স্বার্থপর ও নির্বোধ লোকেরা রয়েছে, যারা তাদের এ আবিষ্কার নিয়ে অত্যন্ত গর্ব প্রকাশ করে, আর তাদের সৃষ্টিকে বিশ্বের জন্য এক উপহার স্বরূপ বর্ণনা করে।

সত্য হল, নিউক্লিয়ার শক্তি ও প্রযুক্তির তথাকথিত কল্যাণকর দিকগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এবং অবহেলা বা দুর্ঘটনার দরুণ ব্যাপক ধ্বংসের কারণ হতে পারে। আমরা ইতোমধ্যেই এমন দুর্যোগ প্রত্যক্ষ করেছি, যেমন আজকের ইউক্রেনের চেরনোবিল-এ ১৯৮৬ সালে সংঘটিত নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনায়, আর গত

বছর ভূমিকম্প ও সুনামীর পর জাপানে, যেখানে তাদেরকে অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছিল, আর পুরো দেশটিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন এমন ঘটনা ঘটে, তখন আক্রান্ত এলাকায় পুনরায় জনবসতি স্থাপন করাও কঠিন হয়ে যায়। তাদের নিজ অনন্য মর্মবিদারক অভিজ্ঞতার কারণে জাপানীরা অত্যন্ত সতর্ক হয়ে গিয়েছে আর প্রকৃতপক্ষে তাদের ভীতি ও আতঙ্ক একেবারেই যথাযথ।

এটা স্পষ্ট যে, যুদ্ধে মানুষ নিহত হয়ে থাকে। আর তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জাপান যোগদান করেছিল তার সরকার এবং জনগণ পুরোপুরি সচেতন থেকে থাকবেন যে, তাদের কিছু মানুষ নিহত হবে। বলা হয়, জাপানে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয় যা তাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪%। যদিও আরো কয়েকটি দেশে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে নিহতের হার আরো বেশি হয়ে থাকবে, তবু জাপানী জনগণের মাঝে যুদ্ধের প্রতি যে ঘৃণা ও বিরাগ আমরা লক্ষ্য করি তা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। নিঃসন্দেহে এর সহজ কারণ দু'টো নিউক্লিয়ার বোমা যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানে ফেলা হয়েছিল, আর যার ফলাফল তারা আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করছে ও বহন করে চলেছে। জাপান তার জনপদসমূহে তুলনামূলক স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় জনবসতি গড়ে তুলে তাদের মহত্ব ও কঠিন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা প্রমাণ করেছে। কিন্তু, এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আজ যদি পুনরায় নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হয়, তাহলে খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোন কোন দেশের কিয়দংশ চির তরে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে যাবে। সেগুলোর আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা কম করে হলেও প্রায় ৬ কোটি ২০ লক্ষ, আর বলা হয় যে নিহতদের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ছিলেন বেসামরিক মানুষ। অন্য কথায়, সামরিক বাহিনীর তুলনায় বেসামরিক মানুষের মধ্যে নিহতের সংখ্যা বেশি ছিল। এত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছিল এ সত্ত্বেও যে জাপান ছাড়া অবশিষ্ট পৃথিবীতে সনাতন মারণাস্ত্র ব্যবহার করে গতানুগতিক যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছিল।

যুক্তরাজ্যে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল। অবশ্য তখনও এটি একটি ঔপনিবেশিক শক্তি হওয়াতে এর উপনিবেশগুলোর মানুষও এর পক্ষে যুদ্ধ করেছে। তাদের ক্ষতি যোগ করলে নিহতের সংখ্যা কয়েক মিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে।

কেবলমাত্র ভারতেই প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিল।

তবে আজ পরিস্থিতি ভিন্ন, আর ঐসব দেশ যারা যুক্তরাজ্যের উপনিবেশ ছিল, আর যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ করেছে, আজ যুদ্ধ শুরু হলে তাদের কেউ কেউ যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধেও লড়তে পারে। উপরন্তু যেমনটি আমি পূর্বেও উল্লেখ করেছি, এমনকি কিছু কিছু ছোট দেশও আজ নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী।

যা আমাদের আতঙ্কিত করে তা এই জ্ঞান যে, এসব নিউক্লিয়ার অস্ত্র তাদের হাতে গিয়ে পড়তে পারে যারা তাদের কর্মের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করার বিচারবোধ রাখে না, বা যারা এ নিয়ে চিন্তা না করারই সিদ্ধান্ত নেয়। প্রকৃতপক্ষে, এমন লোকেরা এর পরিণতির কোন পরোয়াও করে না, আর তারা রক্তের বন্যায় আনন্দ পেয়ে থাকে।

অতএব বড় বড় শক্তিগুলো যদি ন্যায়ের সাথে আচরণ না করে, ছোট ছোট দেশগুলোর অভাব-অভিযোগ দুর না করে, আর উদার ও বিজ্ঞ নীতি গ্রহণ না করে, তাহলে পরিস্থিতি মোড় নিতে নিতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে আর এরপর যে ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হবে তা আমাদের সকল ধারণা ও কল্পনাকে ছাড়িয়ে যাবে। এমনকি বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা শান্তি কামনা করে তারা এ ধ্বংসের আওতায় চলে আসবে।

তাই এটা আমার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আর প্রত্যাশা যে সকল বড় বড় দেশের নেতৃবর্গ এ ভয়াবহ বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে পারবে এবং ফলস্বরূপ, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভের জন্য আগ্রাসনমূলক নীতি ও বলপ্রয়োগের নীতিসমূহ গ্রহণ করবে যা ন্যায়ের প্রসার করবে এবং এর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করবে।

সম্প্রতি একজন উর্ধ্বতন রুশ সামরিক কমান্ডার একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে এক গুরুতর হুঁশিয়ারী প্রদান করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এরূপ যুদ্ধ এশিয়া বা অন্য কোথাও সংঘটিত হবে না, বরং ইউরোপের সীমানায় সংঘটিত হবে, আর পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো হতে এর সূত্রপাত ও বিস্তার ঘটবে। যদিও কেউ কেউ বলবেন এটা একেবারেই তার ব্যক্তিগত অভিমত, আমি নিজে তার দৃষ্টিভঙ্গীকে অসম্ভব মনে করি না। তদুপরি, আমি আরো বিশ্বাস করি যে, যদি এমন যুদ্ধের সূচনা হয় তবে এ সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি যে এতে এশিয়ার দেশগুলোও এতে জড়িয়ে পরবে।

আরেকটি সংবাদ যা সাম্প্রতিককালে মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে তা হল ইসরায়েলী গোয়োন্দা সংস্থা মোসাদ-এর সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধানের একটি

সাক্ষাৎকার। আমেরিকার সুপরিচিত টেলিভিশন চ্যানেল সি.বি.এস. এর সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে এটা ক্রমশঃই স্পষ্ট হচ্ছে যে ইসরায়েলী সরকার ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায়। তিনি বলেন যে, যদি এরূপ আক্রমণ সংঘটিত হয় তাহলে এটা হিসাব করা অসম্ভব যে কত দিনে, কোথায় এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। তাই তিনি জোরের সাথে এরূপ আক্রমণের বিপক্ষে পরামর্শ দেন।

এ ক্ষেত্রে আমার ধারণা এই যে এরূপ যুদ্ধ নিউক্লিয়ার ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে শেষ হবে।

সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিতে এসেছে যেখানে লেখক বলেছেন যে আজকের বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৩২ সালের বিশ্বের পরিস্থিতির সাথে মিল রাখে। তিনি লেখেন যে, বিশেষ কতকগুলো দেশে জনগণ তাদের রাজনীতিবিদদের বা তাদের তথাকথিত গণতন্ত্রের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। তিনি আরো বলেন যে, আরো অনেক মিল ও তুলনা একত্রিত হয়ে আজ সেই চিত্র গঠন করছে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের পূর্বক্ষণে পরিলক্ষিত হয়েছিল।

কেউ এ বিশ্লেষণের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু, অপরপক্ষে আমি এর সাথে একমত এবং এ কারণেই আমি বিশ্বাস করি যে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্বের সরকারগুলোর গভীরভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে কিছু মুসলমান দেশের অত্যাচারী নেতারা, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যে কোন মূল্যে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকা, তাদের সম্বিত ফিরে পাওয়া প্রয়োজন। নতুবা তাদের কর্ম ও তাদের নির্বুদ্ধিতা তাদের ধ্বংসের কারণ হবে, আর তারা নিজেদের দেশগুলোকে এক ভয়ানক পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে।

আমরা যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য, বিশ্বকে ও মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাই। কেননা এ যুগে, আমরা সেই যুগ-ইমামকে মেনেছি যাকে আল্লাহতাআলা প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে পাঠিয়েছেন, এবং যিনি সেই সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত মহামানব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর শিক্ষাকে আমরা অনুসরণ করি বলেই বিশ্বের এ পরিস্থিতিতে আমরা হৃদয়ে চরম মর্মবেদনা ও কষ্ট অনুভব করি। মানবজাতিকে ধ্বংস ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষার প্রয়াসে এ মর্মবেদনাই আমাদের চালিকাশক্তিরূপে কাজ করে। এজন্যই আমি এবং আর সকল আহমদী মুসলমান বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছি।

শান্তির বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি প্রয়াস যা আমি গ্রহণ করেছি তা হল বিশেষ কয়েকজন বিশ্ব নেতার কাছে আমি ধারাবাহিকভাবে পত্র পাঠিয়েছি। কয়েক মাস পূর্বে আমি পোপ বেনেডিক্ট-এর কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছি, যা আমার পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে হাতে হাতে আমার এক আহমদী প্রতিনিধি তাঁর হাতে অর্পণ করেন। সেই পত্রে আমি লিখেছি যে যেহেতু তিনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় গোষ্ঠির প্রধান, তাঁর দায়িত্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হওয়া।

একইভাবে সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে এ সংকটপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছার প্রেক্ষাপটে, আমি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানইয়াহু ও ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমেদিনেজাদ উভয়কে পত্র লিখেছি, যেখানে তাদেরকে মানবজাতির স্বার্থে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে তড়িঘড়ি ও বিবেচনাহীনতা পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছি।

আমি সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার উভয়ের কাছে পত্র লিখে তাদেরকে বিশ্বে শান্তি ও সৌহার্দ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান করেছি।

আমি অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছেও অতি শীঘ্রই লেখা এবং তাঁদেরকে সতর্ক করার পরিকল্পনা করেছি।

আমি জানি না, যে কয়েকজন নেতার কাছে আমি লিখেছি তারা আমার চিঠিকে কোন মূল্য দিবেন কিনা; কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, খলিফা এবং বিশ্বজুড়ে বহু মিলিয়ন আহমদী মুসলমানের নেতা হিসেবে বিশ্বের সংকটময় পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের আবেগ-অনুভূতি জানানো একটি প্রয়াস আমার পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে।

এখানে এটা স্পষ্ট করতে চাই যে ব্যক্তিগত কোন ভীতির কারণে আমি এসব অনুভূতি প্রকাশ করি নি বরং। মানবজাতির জন্য আন্তরিক ভালোবাসার কারণে এরূপ করতে আমি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার ফলে মানবজাতির জন্য এ ভালোবাসা প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের অন্তরে গড়ে উঠেছে এবং স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

আপনারা খুব সম্ভবত: এ কথায় বিস্মিত হবেন বা চমকে উঠবেন যে, মানবজাতির প্রতি আমাদের ভালোবাসা সরাসরি মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ফল। আপনাদের

মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাহলে কেন এমন মুসলিম সন্ত্রাসী দল থাকে যারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করে থাকে, বা কেন এমন মুসলমান সরকার রয়েছে যারা নিজ ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য তাদের নিজেদের জনগণের গণহত্যার আদেশ দিচ্ছে?

এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে এসব আচরণ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পবিত্র কুর'আন কোন অবস্থাতেই চরমপন্থিতা বা সন্ত্রাসের কোন সুযোগ দেয় না।

আজকের যুগে আমাদের বিশ্বাস অনুসারে, খোদাতাআলা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পূর্ণ অনুবর্তিতায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দীরূপে পাঠিয়েছেন। ইসলাম এবং পবিত্র কুর'আনের প্রকৃত সত্য শিক্ষার প্রচারের জন্য মসীহ মাওঊদ (আ.)-কে পাঠানো হয়েছে। তিনি মানুষ এবং সর্বশক্তিমান খোদার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি মানুষের পারস্পরিক অধিকার চিহ্নিত করে সেগুলোর স্বীকৃতি দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি সকল ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। সর্বোচ্চ স্তরের নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং বিশ্ব জুড়ে শান্তি, ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।

যদি আপনি বিশ্বের যে কোন প্রান্তেই যান, আপনি দেখবেন সকল প্রকৃত আহমদীর মধ্যে এ গুণগুলো দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে। আমাদের জন্য না সন্ত্রাসীরা উদাহরণ, আর না নিষ্ঠুর মুসলমান একনায়কেরা বা পশ্চিমা পরাশক্তিসমূহ আমাদের জন্য অনুকরণীয়। আমরা যে উদাহরণের অনুসরণ করি তা ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর; আর পবিত্র কুর'আন হল আমাদের পথ নির্দেশিকা।

অতএব, 'এ পীস সিম্পোজিয়াম' থেকে সারা বিশ্বের কাছে একটি বার্তা আমি প্রেরণ করছি যে, ইসলামের বাণী ও শিক্ষা ভালোবাসা, সহমর্মিতা, অনুগ্রহ ও শান্তির।

দুঃখজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করি যে মুসলমানদের একটি অত্যন্ত সংখ্যালঘু অংশ ইসলামের সম্পূর্ণ বিকৃত এক চিত্র তুলে ধরে তারা তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর চলে। আপনাদের সকলের কাছে আমার আহ্বান যে একে প্রকৃত ইসলাম বলে বিশ্বাস করবেন না আর এসব ভ্রান্ত কর্মকে সংখ্যাগরিষ্ঠ শান্তিপ্রিয় মুসলমানের

অনুভূতিতে পাল্টা আঘাত হানার বা তাদেরকে নিষ্ঠুরতার লক্ষ্যস্থল বানানোর লাইসেন্স হিসেবে গ্রহণ করবেন না।

পবিত্র কুর'আন সকল মুসলমানের পবিত্রতম ধর্মগ্রন্থ আর তাই এর বিষয়ে কটুক্তিমূলক ও নোংরা ভাষা ব্যবহার করলে বা এতে আগুন লাগিয়ে দিলে সেটা নিঃসন্দেহে মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করবে। আমরা দেখি যে যখন এ ধরনের কিছু ঘটে তখন প্রায়ই এর ফলে চরমপন্থী মুসলমানদের সম্পূর্ণ অন্যায় ও অগ্রহণযোগ্য প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

অতি সম্প্রতি আমরা আফগানিস্তানের দু'টো ঘটনা সম্পর্কে জেনেছি যেখানে কিছু মার্কিন সৈন্য পবিত্র কুর'আনের অবমাননা করে, আর নিরীহ নারী-শিশুদের তাদের নিজ বাসগৃহে হত্যা করে। অনুরূপভাবে এক নির্দয় ব্যক্তি ফ্রান্সের দক্ষিণাংশে কোন কারণ ছাড়াই কয়েকজন ফরাসী সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করে। আর এর কয়েক দিন পরে একটি স্কুলে প্রবেশ করে তিনজন ইহুদী শিশু ও তাদের এক শিক্ষককে হত্যা করে।

আমাদের কাছে এরূপ আচরণ সম্পূর্ণ অন্যায় এবং এটা কখনো শান্তি বয়ে আনতে পারে না। আমরা পাকিস্তান এবং অন্যত্রও নিয়মিত এ ধরনের ঘটনা দেখতে পাই, আর এ সব কর্মই ইসলামের শত্রুদেরকে তাদের ঘৃণা প্রকাশের এবং বৃহত্তর পরিসরে তাদের অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য একটি উপলক্ষ্য তৈরি করে দিচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা যখন ক্ষুদ্র বা ব্যক্তি পর্যায়ে ঘটে তখন সেগুলো কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ বা ক্ষোভের কারণে ঘটানো হয় না, বরং এগুলো আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কতিপয় সরকারের অসম নীতিরই ফল।

তাই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি আবশ্যক যে, প্রত্যেক পর্যায়ে আর প্রত্যেক দেশে ন্যায়ের যথাযথ মানদণ্ড গড়ে তোলা হয়। পবিত্র কুর'আনে একজন নির্দোষ মানুষকে হত্যা করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সমতূল্য বলা হয়েছে।

সুতরাং পুনরায় একজন মুসলমান হিসেবে, আমি এটি একেবারে স্পষ্ট করতে চাই যে ইসলাম কোন মাধ্যমে, কোন আকারে বা কোন প্রকারে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের অনুমতি দেয় না। এটি এমন এক আদেশ যার কোন ব্যতিক্রম নেই।

পবিত্র কুর'আন এমনকি এও বলে যে, যদি কোন দেশ বা জাতি তোমাদের সাথে শত্রুতা রাখে, তবুও তাদের সাথে আচরণের সময় সেই শত্রুতা যেন তোমাদেরকে নিরঙ্কুশ ন্যায়বিচার ও পক্ষপাতহীনতা থেকে বিচ্যুত না করে।

কোন শত্রুতা বা রেষারেষি যেন তোমাদের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা জাগিয়ে না তুলে বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে প্ররোচিত না করে। পবিত্র কুর'আনের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এই যে, অন্যের সম্পদের দিকে কখনো ঈর্ষা বা লালসার দৃষ্টি দেয়া যাবে না।

আমি মাত্র কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করেছি, কিন্তু এগুলো এমন যে বিশেষ গুরুত্ব রাখে, কেননা আমাদের সমাজ তথা বৃহত্তর পরিসরে পুরো বিশ্বে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ভিত্তিমূলে এগুলো অবস্থান করে। আমার প্রার্থনা এই যে বিশ্ব যেন এ মূল ইস্যুগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়, যেন অন্যায় ও অসত্যের পক্ষের লোকেরা আজ যে ধ্বংসের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে তা থেকে পৃথিবী রক্ষা পায়।

আমি এ সুযোগে দুঃখ প্রকাশ করতে চাই যে, বেশ খানিকটা সময় আমি নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু, এটা সত্য যে আজ বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সত্য সত্যই বিশাল গুরুত্ব রাখে।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, আর কাল বিলম্ব না করে আমাদের যুগের চাহিদার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে।

আমার বক্তৃতা শেষ করার পূর্বে আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। যেমনটি আমরা অবহিত আছি, সম্প্রতি মহামান্য রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ১১৫ বছর পিছনে ফিরে তাকালে দেখি ১৮৯৭ সালে রাণী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তীও উদ্‌যাপিত হচ্ছিল। সে সময় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য রাণী ভিক্টোরিয়াকে একটি অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেন।

তাঁর বাণীতে তিনি ইসলামের বাণীও মহামান্য রাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে পেশ করেন আর সেই সাথে ব্রিটিশ সরকারের জন্য ও রাণীর দীর্ঘায়ুর জন্য তাঁর দোয়ার বার্তাও পৌঁছান। তাঁর বাণীতে মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেছিলেন যে, রাণীর সরকারের সবচেয়ে বড় গুণ হল যে, তাঁর শাসনাধীন সকল মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

আজকের পৃথিবীতে ভারতীয় উপমহাদেশের উপর ব্রিটিশ সরকারের শাসনের অবসান হয়েছে, কিন্তু, অদ্যাবধি ধর্মীয় স্বাধীনতার মূলনীতিসমূহ ব্রিটিশ সমাজ ও আইনে এমন গভীরভাবে প্রোথিত যে এতে প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে।

নিঃসন্দেহে এ স্বাধীনতার এক অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী উদাহরণ আমরা আজ এ সন্ধ্যায় দেখতে পাচ্ছি যখন বিভিন্ন ধর্ম, মত ও বিশ্বাসের অনুসারীগণ বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্মিলিত প্রত্যাশা নিয়ে এক স্থানে সমবেত হয়েছেন।

সুতরাং, আমি সেই শব্দ ও দোয়া পুনরাবৃত্তি করতে চাই যা হযরত মসীহ মাওঊদ (আ.) ব্যবহার করেছিলেন এবং এ সুযোগে রাণী এলিজাবেথের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন পেশ করতে চাই। যেমনটি তিনি বলেছিলেন:

> ”আমাদের করুণাময়ী রাণীর প্রতি আমাদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অভিনন্দন পেশ করছি। মহামান্য রাণী সদা সুখী ও সন্তুষ্ট থাকুন।”

মসীহ মাওঊদ (আ.) এরপর রাণী ভিক্টোরিয়ার জন্য দোয়া করেন, আর তাই আমি তাঁরই ভাষায় রাণী এলিজাবেথের জন্য দোয়া করি:

> ”হে সর্বশক্তিমান ও মহান খোদা! তোমার অনুগ্রহ ও আশীষে আমাদের সম্মানিত রাণীকে সদা সে রকম সুখী রেখো যেভাবে আমরা তাঁর উদারতা ও অনুগ্রহের অধীনে সুখে-শান্তিতে বসবাস করছি; আর তাঁর প্রতি সেরূপ দয়া ও স্নেহ প্রদর্শন কর যেরূপ শান্তি-সমৃদ্ধিতে আমরা তাঁর শাসনাধীন জীবন অতিবাহিত করছি।”

অতএব, এ হল সেই কৃতজ্ঞতার অনুভূতি যা প্রত্যেক আহমদী মুসলমান ব্রিটিশ নাগরিক ধারণ করে থাকে।

পরিশেষে, আমি আপনাদের সকলের কাছে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আজ এখানে উপস্থিত হয়ে তাদের ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রকাশ করেছেন।

আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

জাতিসমূহের মধ্যে সুবিচারপূর্ণ সম্পর্কই প্রকৃত শান্তির পথ

ক্যাপিটল হিল

ওয়াশিংটন ডি.সি., যুক্তরাষ্ট্র, ২০১২

হযরত খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করছেন প্রথম মুসলিম কংগ্রেসম্যান কেইথ এলিসন
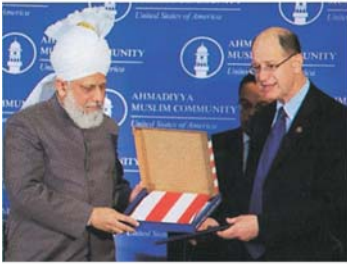
হযরত খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.)-কে আমেরিকান পতাকা উপহার দিচ্ছেন ব্রাড শেরম্যান (ইউনাইটেড স্টেটস হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এর ডেমোক্র্যাটিক মেম্বার)।
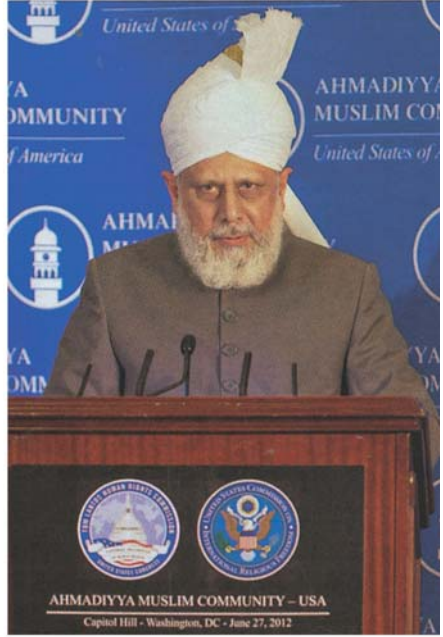
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.) যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে প্রদত্ত ভাষনে তাঁর কী-নোট প্রদান করছেন

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.) ক্যাপিটল হিলে দোয়া পরিচালনা করছেন

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে নির্ধারিত সফরে
হযরত খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.)

যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটসম্যান ও আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে
ঐতিহাসিক ভাষণদানের পর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে
হযরত খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.)

পটভূমি

২৭শে জুন, ২০১২ ওয়াশিংটন ডি.সি.-র ক্যাপিটল হিল (সংসদ ভবন)-এ মসীহ মাওঊদ (আ.)-এর পঞ্চম খলিফা ও আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, রাষ্ট্রদূত, হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা, এন.জি.ও. নেতা, ধর্মীয় নেতা, অধ্যাপক, নীতির বিষয়ে পরামর্শক, আমলা, কূটনীতিবিদ, বিভিন্ন থিংক ট্যাংক ও পেন্টাগন-এর প্রতিনিধি এবং মিডিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকগণ-এর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। অভূতপূর্ব এ সভাটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতাদের কয়েকজন, যাদের মধ্যে রয়েছেন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স-এর ডেমোক্র্যাটিক দলের নেতা অনারেবল ন্যান্সী পেলোসি, এর জন্য বিশ্ব শান্তি সম্পর্কে ইসলামের বাণী সরাসরি শোনার সুযোগ করে দেয়। অনুষ্ঠানের পর হুযূর (আই.)-কে ক্যাপিটল হিল (সংসদ) ভবন ঘুরিয়ে দেখানো হয়, এরপর তাঁকে সম্মানের সাথে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স-এ নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁর এ যুক্তরাষ্ট্র সফরের সম্মানে একটি সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

এ সিদ্ধান্তের ভূমিকায় বলা হয়েছে:

> "আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ-কে ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে স্বাগত জানিয়ে এবং বিশ্বশান্তি, ন্যায়, অহিংসতা, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি জানিয়ে ..."

ক্যাপিটল হিলের অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের তালিকা নিম্নরূপ:

- যুক্তরাষ্ট্র সিনেটর রবার্ট কেসী, সিনিয়র (ডেমেক্র্যাট পেনসিলভেনিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র সিনেটর জন কর্নিন (রিপাবলিকান টেক্সাস)
- ডেমোক্র্যাট নেতা কংগ্রেসউওম্যান ন্যান্সী পেলোসী (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান কীথ এলিসন (ডেমোক্র্যাট মিনেসোটা)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান ব্র্যাডলী শারম্যান (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান ফ্র্যাঙ্ক উল্‌ফ (রিপাবলিকান ভার্জিনিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান মাইকেল হোন্ডা (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান টিমোথি মারফি (রিপাবলিকান পেনসিলভেনিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসউওম্যান জীনেট শ্মিট (রিপাবলিকান ওহাইও)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসউওম্যান জ্যানিস হান (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসউওম্যান জ্যানিস শাকোভস্কি (ডেমোক্র্যাট ইলিনয়)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসউওম্যান জ্যাকী স্পীয়ার (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসউওম্যান যোই লফগ্রেন (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসউওম্যান শীলা জ্যাকসন লী (ডেমোক্র্যাট টেক্সাস)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান গ্যারী পিটার্‌স (ডেমোক্র্যাট মিশিগান)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান টমাস পেট্রি (রিপাবলিকান উইস্‌কন্‌সিন)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান এ্যাডাম শিফ (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান মাইকেল কাপুয়ানো (ডেমোক্র্যাট ম্যাসাচুসেট্‌স)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান হাওয়ার্ড বারম্যান (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসউওম্যান জুডি চু (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান আন্দ্রে কারসন (ডেমোক্র্যাট ইন্ডিয়ানা)

- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসউওম্যান লরা রিচার্ডসন (ডেমোক্র্যাট ক্যালিফোর্নিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান লয়েড পো (রিপাবলিকান টেক্সাস)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান বারনী ফ্র্যাঙ্ক (ডেমোক্র্যাট ম্যাসাচুসেট্স)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান ব্রুস ব্রেলী (ডেমোক্র্যাট আইওয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান ডেনিস কুচিনিচ (ডেমোক্র্যাট ওহাইও)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান ট্রেন্ট ফ্রাঙ্ক্স (রিপাবলিকান এ্যারিযোনা)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান ক্রিস মারফি (ডেমোক্র্যাট কানেটিকাট)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান হ্যাঙ্ক জনসন (ডেমোক্র্যাট জর্জিয়া)
- যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসম্যান জেম্স ক্লাইবার্ন (ডেমোক্র্যাট সাউথ ক্যারোলাইনা)
- হিজ এক্সিলেন্সী বকারী কর্টু স্টিভেন্স, যুক্তরাষ্ট্রে সিয়েরা লিওনের রাষ্ট্রদূত
- ড. ক্যাটরিনা ল্যান্টোস সোয়েট, চেয়ারউওম্যান, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন
- অনারেবল টিম কেইন, সাবেক গভর্নর, ভার্জিনিয়া
- রাষ্ট্রদূত সুসান বার্ক, নিউক্লিয় অস্ত্রের প্রসার রোধে রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার বিশেষ দূত
- রাষ্ট্রদূত সুজান জনসন কুক, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের এ্যম্বাসাডর এ্যাট লার্জ
- অনারেবল খালেদ আলজালাহ্মা, ডেপুটি চীফ অফ মিশন, যুক্তরাষ্ট্রে বাহ্রাইন রাজতন্ত্রের দূতাবাস
- রেভারেন্ড মনসাইনর জাঁ-ফ্রাসোয়া ল্যান্থিউম, ফার্স্ট কাউন্সেলর (ডেপুটি চীফ অফ মিশন), যুক্তরাষ্ট্রে দি হলি সী (ভ্যাটিকান)-এর দূতাবাস (এপোস্টোলিক নান্সিয়েচার)
- মিয. সারা আল-ওজাইলি, জনসংযোগ/লিয়াজোঁ অফিসার, যুক্তরাষ্ট্রে ওমান সুলতানাতের দূতাবাস
- মি. সেলিম আল কিন্দী, ফার্স্ট সেক্রেটারী, যুক্তরাষ্ট্রে ওমান সুলতানাতের দূতাবাস
- মিয. ফওযিয়া ফাইয়ায, যুক্তরাষ্ট্রে ওমান পাকিস্তানের দূতাবাস
- অনারেবল সাইদা যায়েদ, কাউন্সেলর, যুক্তরাষ্ট্রে মরক্কোর দূতাবাস

- অনারেবল নাবীল মুনির, মিনিস্টার-ওঠ (নিরাপত্তা পরিষদ), জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী মিশন
- অনারেবল জোসেফ রেঙ্গলি, মিনিস্টার-কাউন্সেলর, যুক্তরাষ্ট্রে সুইজারল্যান্ডের দূতাবাস
- অনারেবল এ্যালিসা আয়ার্স, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)
- রাষ্ট্রদূত কার্ল ইন্ডারফুর্থ, সিনিয়র উপদেষ্টা এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত পলিসি স্টাডিজ বিষয়ক ওয়াধওয়ানি চেয়ার, সেন্টার ফর স্ট্র্যাটিজিক এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ
- অনারেবল ডনাল্ড এ. ক্যাম্প, সিনিয়র এ্যাসোশিয়েট, সেন্টার ফর স্ট্র্যাটিজিক এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ
- রাষ্ট্রদূত জ্যাকী উওলকট, নির্বাহী পরিচালক, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন
- ড. আযীযাহ আল-হিবরী, কমিশনার, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন
- মি. ইসাইয়াহ লেগেট, কাউন্টি এক্সিকিউটিভ, মন্টগমারী কাউন্টি, ম্যারিল্যান্ড
- মিয ভিক্টোরিয়া আলভারাদো, পরিচালক, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক দপ্তর, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট
- ড. ইমাদ দীন আহমদ, পরিচালক, মিনারেট অফ ফ্রিডম ইন্সটিটিউট
- ড. যয়নব আলওয়ানী, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, স্কুল অফ ডিভিনিটি, হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
- মিয. ডেবোরা এল. বেনেডিক্ট, এ্যাসোশিয়েট কাউন্সেল, যুক্তরাষ্ট্র সিটিজেনশিপ এ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস, ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি
- মিয. লরা বার্গ, মুসলিম সম্প্রদায় বিষয়ক সিনিয়র উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট
- ড. চার্লস বাটারওয়ার্থ, প্রফেসর (ইমেরিটাস), গভর্নমেন্ট এ্যান্ড পলিটিক্স, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যারিল্যান্ড এ্যাট কলেজ পার্ক

- ফাদার জন ক্রসিন, নির্বাহী পরিচালক, সেক্রেটারিয়েট ফর একুমেনিকাল এ্যান্ড ইন্টার-রিলিজিয়াস এ্যাফেয়ার্স, যুক্তরাষ্ট্র ক্যাথলিক বিশপ কনফারেন্স
- মেজর (অব.) ফ্রান্য গেইল, সিনিয়র বিজ্ঞান উপদেষ্টা, যুক্তরাষ্ট্র মেরিন কোর
- ড. সু গুরু ওয়াদেনা-ভন, পরিচালক, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া প্রোগ্রাম, ফ্রিডম হাউস
- মি. ফ্রাঙ্ক জানুযি, প্রধান, ওয়াশিংটন অফিস, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাষ্ট্র
- মি. টি. কুমার, আন্তর্জাতিক এ্যাডভোকেসি পরিচালক, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, যুক্তরাষ্ট্র
- মি. জর্জ লেভেন্থাল, সদস্য, মন্টগোমারি কাউন্টি কাউন্সিল
- মি. আমের লতিফ, ভিজিটিং ফেলো, সেন্টার ফর স্ট্র্যাটিজিক এ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ
- মি. টিম লেন্ডারকিং, পরিচালক, পাকিস্তান ডেস্ক অফিস, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট
- মি. জালাল মালিক, ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র আর্মি ন্যাশনাল গার্ড
- মি. নাভীদ মালিক, ফরেন সার্ভিস অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট
- মিয. ডালিয়া মোগাহেদ, সিনিয়র বিশ্লেষক ও নির্বাহী পরিচালক, গ্যালাপ সেন্টার ফর মুসলিম স্টাডিজ
- মি. পল মন্টিরো, এ্যাসোশিয়েট ডিরেক্টর, হোয়াইট হাউজ অফিস অফ পাবলিক এনগেজমেন্ট
- মেজর জেনারেল ডেভিড কোয়ান্টক, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট আর্মি প্রভোস্ট জেনারেল
- মিয্ টিনা রামিরেয, পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিলেশন্স, দি বেকেট ফান্ড
- র‍্যাবাই ডেভিড সেপারস্টাইন, ডিরেক্টর এ্যান্ড কাউন্সেল, রিলিজিয়াস এ্যাকশন, রিলিজিয়াস এ্যাকশন সেন্টার ফর রিফর্ম জুডাইজম

- চ্যাপলেইন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ্যালফোন্স স্টিফেনসন, ডিরেক্টর অফ দ্য ন্যাশনাল গার্ড ব্যুরো অফিস অফ দ্য চ্যাপলেইন
- মি. নক্স টেম্‌স, পরিচালক, পলিসি এ্যান্ড রিসার্চ, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন
- মি. এরিক ট্রীন, ধর্মীয় বৈষম্য বিষয়ক স্পেশাল কাউন্সেল, সিভিল রাইট্‌স ডিভিশন, যুক্তরাষ্ট্র ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস
- ড. হাসান আব্বাস, প্রফেসর, রিজিওনাল এ্যান্ড এ্যানালিটিকাল স্টাডিজ বিভাগ, ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি
- মি. মালিক সিরাজ আকবর, রেগান-ফ্যাস্কেল ফেলো, ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি
- মি. ম্যাথিউ কে. আসাদা, কংগ্রেস (সংসদ) সদস্য গ্যারি পিটার্‌স এর কংগ্রেশনাল ফেলো
- মিয. স্টেসি বারডেট, সরকার ও জাতীয় বিষয়ক পরিচালক, এ্যান্টি-ডিফেমেশন লীগ
- মিয. এলিজাবেথ ক্যাসিডি, উপ-পরিচালক, পলিসি এ্যান্ড রিসার্চ, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন
- মিয. এইমী চিউ, পরিচালক, মিডিয়া, যোগাযোগ ও জনসংযোগ, এ্যামেরিকান ইসলামিক কংগ্রেস
- মি. কর্নেলিয়াস ক্রেমিন, ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট, গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম ব্যুরো, ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক ও ফরেন এ্যাফেয়ার্‌স অফিসার ফর পাকিস্তান
- মি. সদানন্দ ধূম, রেসিডেন্ট ফেলো, এ্যামেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট
- ড. রিচার্ড গ্যাথরো, ডীন, নায়াক কলেজ, ওয়াশিংটন ডি.সি.
- মি. জো গ্রিবোস্কি, চেয়ারম্যান, দি ইনস্টিটিউট অন রিলিজিয়ন এ্যান্ড পাবলিক পলিসি
- মিয. সারাহ গ্রিবোস্কি, দি ইনস্টিটিউট অন রিলিজিয়ন এ্যান্ড পাবলিক পলিসি
- ড. ম্যাক্স গ্রস, এ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর, প্রিন্স আল-ওয়ালিদ বিন তালাল সেন্টার ফর মুসলিম-ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডিং, জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়

- ড. রিয়াজ হায়দার, ক্লিনিকাল প্রফেসর অফ মেডিসিন, জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়
- মিয. হুমা হক, সহকারী পরিচালক, সাউথ এশিয়া সেন্টার, আটলান্টিক কাউন্সিল
- মি. জয় কানসারা, এ্যাসোশিয়েট ডিরেক্টর, হিন্দু এ্যামেরিকান ফাউন্ডেশন
- মি. হামিদ খান, সিনিয়র প্রোথ অফিসার, রুল অফ ল সেন্টার, যুক্তরাষ্ট্র ইনস্টিটিউট অফ পীস
- মিয. ভ্যালেরী কার্কপ্যাট্রিক, এসোশিয়েট ফর রেফিউজিস এ্যান্ড ইউ.এস. এ্যাডভোকেসী, হিউম্যান রাইট্স ওয়াচ
- মি. এ্যালেক্স ক্রনেমার, ইউনিটি প্রোডাক্শন্স
- মি. পল লিবেন, এক্সিকিউটিভ রাইটার, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন
- মিয. এ্যামি লিলিস, ফরেন এ্যাফেয়ার্স অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট
- মি. গ্রাহাম মেসন, কংগ্রেস (সংসদ) সদস্য এ্যালিসন শোয়ার্জ এর লেজিস্লেটিভ এ্যাসিস্টেন্ট
- মিয. লরেন মার্কো, রিলিজিয়ন নিউজ সার্ভিস
- মি. ড্যান মেরিকা, সিএনএন.কম
- মি. জোসেফ ভি. মন্টভিল, সিনিয়র এ্যাসোশিয়েট, মেরিম্যাক কলেজ সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ জিউইশ-ক্রিশ্চিয়ান-মুসলিম রিলেশন্স
- মি. এ্যারন মায়ার্স, প্রোগ্রাম অফিসার, ফ্রিডম হাউস
- মিয. আতিয়া নসর, রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটিং অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট
- মিয. মেলানী নেযের, সিনিয়র ডিরেক্টর, যুক্তরাষ্ট্র পলিসি এ্যান্ড এ্যাডভোকেসি, এইচ.আই.এ.এস.
- ড. এলিয়ট প্যারিস, বাউই স্টেট ইউনিভার্সিটি
- মি. জন পিনা, পরিচালক, সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, এ্যামেরিকান ইসলামিক কংগ্রেস

- মি. আরিফ রফিক, এ্যাডজাঙ্কট স্কলার, মিড্ল ইস্ট ইনস্টিটিউট
- মিয. মায়া রাজারত্নম, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল
- মিয. র‍্যাচেল সয়ার, ফরেন এ্যাফেয়ার্স অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট
- ড. জেরোম শীল, ডীন, কলেজ অফ প্রফেশনাল স্টাডিজ, বাউই স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়
- মিয. সামান্থা শ্লিট্যার, স্টাফ, যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা কমিশন
- ড. মেরি হোপ শোবেল, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, একাডেমি ফর ইন্টারন্যাশনাল কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড পীসবিল্ডিং, যুক্তরাষ্ট্র ইনস্টিটিউট ফর পীস
- মিয. সারাহ শ্লেসিঙ্গার, ইন্টারন্যাশনাল এ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিলেশন্স এ্যাসোশিয়েট, দ্য বেকেট ফান্ড
- ড. ফ্রাঙ্ক সেলিন, কিরগিস্তান ডেস্ক অফিসার, যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট
- মিয. আনা-লী স্টাঙ্গল, ক্রিশ্চিয়ান সলিডারিটি ওয়ার্ল্ডওয়াইড
- মিয. কালিন্ডা স্টিফেনসন, প্রফেশনাল স্টাফ, টম লান্টোস হিউম্যান রাইট্স কমিশন
- মি. জর্ডান টামা, লীড ডেমোক্র্যাটিক স্টাফার, টম লান্টোস হিউম্যান রাইট্স কমিশন
- মি. শন ট্যান্ডন, এ.এফ.পি.
- ড. উইলহেল্মাস ভঙ্কেনবার্গ, প্রফেসর, ধর্ম ও সংস্কৃতি, দি ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অফ এ্যামেরিকা
- মি. এ্যান্থনি ভান্স, পরিচালক বহিঃসম্পর্ক, বাহাইস অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস
- মি. জিহাদ সালেহ উইলিয়ামস, গভর্নমেন্ট এ্যাফেয়ার্স রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইসলামিক রিলিফ, যুক্তরাষ্ট্র
- মিয. এ্যামিলিয়া ওয়াং, কংগ্রেসউওম্যান জুডি চু এর চীফ অফ স্টাফ
- মিয. মোহ শর্মা, কংগ্রেসউওম্যান জুডি চু এর লেজিস্লেটিভ ফেলো

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেস – হাউজ রেজলিউশন ৭০৯

১১২তম কংগ্রেস
দ্বিতীয় অধিবেশন

হাউজ রেজলুশন ৭০৯

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক প্রধান হিজ হোলিনেস হযরত মির্যা মসরূর আহমদ-কে ওয়াশিংটন ডিসি-তে স্বাগত জানিয়ে এবং বিশ্ব শান্তি, অহিংসতা, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ও গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ চেষ্টার স্বীকৃতি জানিয়ে।

হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্‌স-এ
জুন ২৭, ২০১২

মিয. যোই লফগ্রেন অফ ক্যালিফোর্নিয়া (নিজের এবং মি. শারম্যান, মি. কনোলি অফ ভার্জিনিয়া, মি. হিঞ্চি, মিয. এশু, মি. স্পিয়ার, মিয. রিচার্ডসন, মি. শিফ, মিয.শাকোভস্কি, মি. হন্ডা, মি. উওল্ফ, মি. পিটার্‌স, মি. ডেন্ট, মিয. চু, মি. বারম্যান, মি. ফ্রাঙ্কস অফ এ্যারিযোনা, মিয. জ্যাকসন লী অফ টেক্সাস, মিয.শোয়ার্জ, মি. ব্রেলী অফ আইওয়া এবং মি. ম্যাকগভার্ন এর পক্ষ থেকে) নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পেশ করেন, যা ফরেন এ্যাফেয়ার্‌স কমিটিতে প্রেরিত হয়।

সিদ্ধান্ত

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক প্রধান হিজ হোলিনেস হযরত মির্যা মসরূর আহমদ-কে ওয়াশিংটন ডিসি-তে স্বাগত জানিয়ে এবং বিশ্ব শান্তি, অহিংসতা, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ও গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ চেষ্টার স্বীকৃতি জানিয়ে।

যেহেতু, বিশ্ব জুড়ে বহু মিলিয়ন অনুসারীর সংগঠন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ও প্রশাসনিক

প্রধান হিজ হোলিনেস হযরত মির্যা মসরূর আহমদ জুন ১৬, ২০১২ থেকে জুলাই ২, ২০১২ এক ঐতিহাসিক সফরে যুক্তরাষ্ট্র এসেছেন;

যেহেতু, হিজ হোলিনেস এপ্রিল ২২, ২০০৩ মির্যা গোলাম আহমদ-এ পঞ্চম খলিফা নির্বাচিত হন, একটি পদ যাতে তিনি আমৃত্যু আসীন থাকবেন;

যেহেতু, হিজ হোলিনেস শান্তির সপক্ষে সক্রিয় একজন শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতা যিনি তাঁর খুৎবা, বক্তৃতা, বই ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে মানবসেবা, সার্বজনীন মানবাধিকার, এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য সমাজ সংক্রান্ত আহমদীয়া মূল্যবোধসমূহের প্রসারে অবিরাম চেষ্টায় রত আছেন;

যেহেতু, আহমদীয়া সম্প্রদায় বার বার বিভিন্ন প্রকারের বৈষম্য, নিপীড়ন ও সহিংসতাসহ বিভিন্ন প্রকার অত্যাচারের শিকার হয়েছে;

যেহেতু, মে ২৮, ২০১০ পাকিস্তানের লাহোরে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের দু'টি মসজিদে আহমদীয়া-বিরোধী সন্ত্রাসীদের আক্রমণে ৮৬ জন আহমদী মুসলমান নিহত হন;

যেহেতু, আহমদী মুসলমানেরা বিরামহীন সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের শিকার হওয়া সত্ত্বেও হিজ হোলিনেস এখনো সহিংসতা অবলম্বনকে নিষেধ করে চলেছেন;

যেহেতু, হিজ হোলিনেস মানবতার সেবার পথকে প্রশস্ত করতে বিশ্ব জুড়ে সফর করে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন;

যেহেতু, যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সফরকালে তিনি সম্পর্ক বন্ধন দৃঢ় করতে এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথের অনুসন্ধান করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উলে- খযোগ্য নেতৃবর্গ ছাড়াও হাজার হাজার আহমদী মুসলমানের সাক্ষাৎ করবেন;

যেহেতু, জুন ২৭, ২০১২ সকালে হিস হোলিনেস ক্যাপিটল হিলের রেবার্ন হাউজ অফিস বিল্ডিং-এ এক বিশেষ দ্বিপাক্ষিক সম্বর্ধনায় ”জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সুসম্পর্কই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ” শীর্ষক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন: অতএব এখন নেয়া হোক এ

১ সিদ্ধান্ত, যে হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ্স-

২ (১) হিজ হোলিনেস মির্যা মসরূর আহমদকে

৩ ওয়াশিংটন ডিসি-তে স্বাগত জানায়;

৪ (২) ব্যক্তিগত ও বিশ্ব শান্তি এবং ব্যক্তিগত

৫ ও বিশ্ব পর্যায়ে ন্যায় এর প্রসারের জন্য

৬ হিজ হোলিনেসের প্রশংসা করে; এবং

৭ (৩) আহমদী মুসলমানদের সর্বদা, এমনকি নিপীড়নের

৮ মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সহিংসতা থেকে দুরে থাকার পরামর্শ দানে

৯ ধৈর্যের জন্য হিজ হোলিনেসের প্রশংসা করে।

জাতিসমূহের মধ্যে সুবিচারপূর্ণ সম্পর্কই প্রকৃত শান্তির পথ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ-আপনাদের সকলের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি ও আশিস বর্ষিত হোক।

আপনারা সময় বের করে আমার বক্তব্য শুনতে এসেছেন- তাই প্রথমেই আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাকে এমন একটি বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে যা অত্যন্ত ব্যাপক। এর বহুবিধ দিক রয়েছে। তাই আমার পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বিষয়টির খুঁটিনাটি তুলে ধরা সম্ভব নয়। আর যে বিষয়ে আমাকে বলতে বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়'। আজকের পৃথিবীর জন্য নিঃসন্দেহে এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য একটি বিষয়। সময়ের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি "জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সুসম্পর্ক রচনায় ইসলামী শিক্ষা'-এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য তুলে ধরবো।

প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অর্জিত হতে পারে না। আর এই নীতিটি জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করেন। নৈরাজ্য সৃষ্টিতে বদ্ধপরিকর কিছু মানুষ ছাড়া কেউ একথা দাবী করে বলতে পারে না, অমুক সমাজে বা দেশে অথবা গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানে অশান্তি ও অরাজকতা বিরাজ করছে। এতদসত্ত্বেও, আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির রাজত্ব বিরাজ

করতে দেখছি। বিভিন্ন দেশের ভেতরে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমন নৈরাজ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সব সরকারের পক্ষ থেকে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তাদের নীতি নির্ধারণের দাবী থাকা সত্ত্বেও এই বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ বিদ্যমান। অথচ সবাই দাবী করে বলে, শান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো তাদের মূল লক্ষ্য! কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিতে, বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে আর এর ফলে যে নৈরাজ্য ছড়িয়ে পড়ছে- এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতে পরিস্কারভাবে প্রমাণিত হয়, এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের কোন পর্যায়ে ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে। তাই যেখানে বা যখনই বৈষম্য চোখে পড়ে তা দূর করা এবং এ উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করা একান্ত অপরিহার্য। আর তাই নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হিসেবে, ন্যায়ের ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও শান্তি অর্জনের উপায় সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয় সংগঠন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো, যে মসীহ্ এবং সংস্কারকের এ যুগে আবির্ভাবের ও বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করার কথা ছিল, তিনি সত্যিই এসে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-ই হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও সংস্কারক। আর এ কারণে আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কুরআনের অনুশাসন মেনে চলি আর ইসলামের সেই প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষার প্রচার করি যার ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে আমি যা বলবো তা হবে কুরআনের শিক্ষার আলোকে।

বিশ্বে শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে আপনারা সকলে নিয়মিতভাবে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন এবং নিঃসন্দেহে অনেক উদ্যোগও নেন। আপনাদের সৃজনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত মন-মানসিকতা আপনাদেরকে মহৎ ধ্যান-ধারণা, পরিকল্পনা এবং শান্তি স্থাপনের বিভিন্ন রূপরেখা উপস্থাপনে সহায়তা করে। তাই এ বিষয়ে জাগতিক বা রাজনৈতিক আঙ্গিকে আমার বলার প্রয়োজন নেই, বরং ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় তাই হবে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। আর আগেই বলেছি, এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক-নির্দেশিকা উপস্থাপন করবো।

একথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, মানবীয় জ্ঞান ও মেধা ত্রুটিমুক্ত নয়, বরং এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার বা চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা নির্ধারণের সময়, প্রায়শই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মানব হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে বিচার ক্ষমতাকে কলুষিত করে দিতে পারে এবং এর পরিণতিতে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লিপ্তও হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি অন্যায় ফলাফল নির্ধারণ ও অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর আইন নিখুঁত; হীন স্বার্থসিদ্ধি বা অন্যায্য কোন উপকরণই এতে থাকে না। এর কারণ হলো, আল্লাহ্, তাঁর সৃষ্টির জন্য কেবল মঙ্গলই কামনা করে থাকেন আর তাই তাঁর আইন হলো সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য। পৃথিবীর মানুষ যেদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, সেদিন প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির ভিত রচিত হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে, কয়েকটি দেশের নেতারা ভবিষ্যতে বিশ্বের সকল জাতির মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে 'লীগ অব্ নেশনস্' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূল লক্ষ্য ছিল, বিশ্বজুড়ে শান্তি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের যুদ্ধ প্রতিহত করা। দুঃখজনকভাবে, এর সংবিধান ও প্রস্তাবাবলীতে এমন কিছু ত্রুটি এবং দুর্বলতা ছিল যা সমভাবে সকল মানুষ ও সকল জাতির অধিকার সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেই অনেক দেশ একের পর এক 'লীগ' থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এতে বিরাজমান সেই অসাম্যের কারণে দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অর্জন সম্ভব হয় নি। 'লীগের' প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং এ পৃথিবীকে সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে ঠেলে দেয়। আমরা সবাই এই বিশ্বযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত। এতে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, যাদের অনেকেই ছিল বেসামরিক নিরীহ জনসাধারণ।

এই যুদ্ধ বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট সাব্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। এটি ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে সকল পক্ষের প্রাপ্য অধিকার নিশ্চিত করে এমন বিচক্ষণ নীতি নির্ধারণের উপলক্ষ হওয়া উচিত ছিল যা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার একটি উপকরণ সাব্যস্ত হতে পারতো। তৎকালীন বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উদ্যোগ নেয় আর এভাবে 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু অচিরেই একথা স্পষ্ট হয়ে যায়, যে মহান লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল তা আজও অর্জিত হয় নি। ইদানিং কয়েকটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অকপট বিবৃতি নিঃসন্দেহে এর ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে।

প্রশ্ন হলো, ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে আর শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইসলামের ভাষ্য কি? পবিত্র কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১৪ নম্বর আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মানুষে মানুষে জাতিগত ভিন্নতা বা কৃষ্টিগত পার্থক্য আমাদের পরিচিতির একটি মাধ্যম মাত্র, কিন্তু এটি কারও উপর অন্য কারও শ্রেষ্ঠত্ব কোনভাবেই সাব্যস্ত বা প্রদান করে না। কুরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর শেষ ভাষণে সকল মুসলমানকে চিরকাল একথা স্মরণ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, একজন আরববাসী একজন অনারবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়, আবার একজন অনারবও একজন আরবের উপর কোন ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। তিনি আরও বলেছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ একজন কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিও একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। অতএব সকল জাতি ও সকল বর্ণের মানুষ সমান- এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা। আর একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সকল মানুষকে বৈষম্য ও পক্ষপাতহীনভাবে সম অধিকার প্রদান করা উচিত। এটিই হচ্ছে বিভিন্ন দল ও জাতির মাঝে সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল পন্থা ও অপরিহার্য সূত্র।

কিন্তু আজ আমরা শক্তিশালী এবং দুর্বল জাতিসমূহের মাঝে পারস্পরিক বিভেদ ও বৈষম্য দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের মাঝে আমরা বৈষম্য লক্ষ্য করি। অনুরূপভাবে, নিরাপত্তা পরিষদে কিছু 'স্থায়ী' সদস্য আছে আবার কিছু আছে 'অস্থায়ী'। এই বিভাজন উদ্বেগ ও হতাশার আভ্যন্তরীণ একটি কারণ হিসেবে প্রমাণিত আর এজন্য আমার প্রায়শই কয়েকটি দেশকে এই অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর দেখতে পাই।

ইসলাম ধর্ম সকল ক্ষেত্রে নিখাদ ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সাম্যের শিক্ষা দেয়। আমরা পবিত্র কুরআনের ৫ নম্বর সূরার ৩ নম্বর আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেখতে পাই। এই আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়ের দাবী সমুন্নত রাখতে হলে এমন লোকদের সাথেও ন্যায্য ও সাম্যের আচরণ করা আবশ্যক যারা ঘৃণ্য ও শত্রুতা প্রদর্শনে সকল সীমা অতিক্রম করে। আর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, যেখানে যেই তোমাদেরকে কল্যাণ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান করে তোমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। আর যে-ই যেক্ষেত্রে পাপ ও অন্যায় করতে তোমাদের পরামর্শ দেয়, তোমাদের তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দাঁড়ায়,

ইসলাম যে ন্যায়পরায়ণতার কথা বলে, এর মানদন্ড কী? পবিত্র কুরআনের ৪ নম্বর সূরার ১৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কাউকে যদি তার নিজের বিরুদ্ধে বা তার পিতামাতার বিরুদ্ধে বা তার সবচেয়ে প্রিয় কারও বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, ন্যায়-নীতি এবং সত্যকে সুন্নত রাখার জন্য তার এ কাজ করা উচিত।

নিজেদের অধিকারের নামে শক্তিশালী ও উন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে দরিদ্র ও দুর্বল দেশুগলোর প্রাপ্য অধিকার খর্ব করা উচিত নয়, আর দরিদ্র জাতিগুলোর প্রতি অন্যায় আচরণ করা থেকেও তাদের বিরত থাকা উচিত। পক্ষান্তরে, দরিদ্র ও দুর্বল জাতিগুলোর উচিত, তারা যেন শক্তিশালী বা উন্নত জাতিগুলোর ক্ষতিসাধনের সুযোগ সন্ধান না করে। বরং, উভয় পক্ষেরই ন্যায়-নিষ্ঠার নীতিমালা মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। সত্যিকার অর্থে, এটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি-সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ন্যায় নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতির মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরেকটি শর্তের কথা পবিত্র কুরআনের ১৫ নম্বর সূরার ৮৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, কোন পক্ষই যেন অপরের সম্পদ ও বিত্তের প্রতি ঈর্ষার বা লোভাতুর দৃষ্টিতে না তাকায়। একইভাবে, এক দেশের পক্ষ থেকে আরেক দেশকে সহায়তা বা সমর্থন দানের মিথ্যা অজুহাতে তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস বা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করা উচিত নয়। অনুরূপভাবে, অন্যের দুর্বলতার সুযোগে রাষ্ট্রসমূহকে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের নামে তাদেরকে ভারসাম্যহীন ব্যবসায়িক লেনদেন বা চুক্তিতে বাধ্য করা উচিত নয়। একইভাবে, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির বা সহায়তা প্রদানের নামে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও সম্পত্তি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার ফন্দি আঁটা উচিত নয়। নিজেদের প্রাকৃতিক সম্পদ কিভাবে যথাযথ ব্যবহার করতে হয় তা স্বল্প শিক্ষিত সমাজ বা সরকারকে শেখানো উচিত। জাতি এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো, সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে সেবা ও সাহায্য প্রদান করা। তবে এই ধরনের সেবা জাতীয় বা রাজনৈতিক সুবিধা অর্জনের জন্য বা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যেন না হয়।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত ছয় বা সাত দশক ধরে জাতিসংঘ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নে সাহায্য করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। এই প্রচেষ্টায় তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ উদঘাটন করেছে। এত সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোন দরিদ্র দেশই উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে উপনীত হতে পারে নি। এর অন্যতম একটি কারণ হলো, এসব দরিদ্র দেশের শাসকদের

ব্যাপক দুর্নীতি। যদিও দুঃখের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে, উন্নত দেশগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে এরপরও এসব সরকারের সাথে লেনদেন অব্যাহত রেখেছে। এদের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেন, আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং ব্যবসায়িক চুক্তির ধারা অব্যাহত থেকেছে। এর ফলে, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেণীর মাঝে হতাশা এবং অস্থিরতা ক্রমাগতভাবে বেড়েছে যা এসব দেশে বিদ্রোহ ও আভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নশীল দেশুগলোর দরিদ্র জনগণ এত বেশী হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা কেবল নিজেদের নেতাদের বিরুদ্ধেই ক্ষুব্ধ নয় বরং পশ্চিমা দেশগুলোর বিরুদ্ধেও তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ। এমতাবস্থায়, চরমপন্থী দলগুলোর হাত শক্তিশালী হচ্ছে- যারা এই হতাশার সুযোগ নিয়ে এসব হতাশাগ্রস্ত লোককে তাদের দলে ভিড়াতে চেষ্টা করছে এবং তাদের ঘৃণা সর্বস্ব মতবাদের পক্ষে সমর্থন আদায়ে সক্ষম হচ্ছে। এর চূড়ান্ত পরিণতিতে বিশ্ব শান্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। ইসলাম আমাদের মনোযোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় উপকরণের প্রতি আকর্ষণ করে। এজন্য চাই অকৃত্রিম ন্যায়পরায়ণতা। এর জন্য সবসময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহার্য। আমরা যেন অন্য কারও সম্পদের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে না তাকাই এটি হলো এর দাবী। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থসিদ্ধির সেবার চেতনা ও প্রেরণা নিয়ে অনুন্নত ও দরিদ্র জাতিসমূহের সাহায্য ও সেবা করবে, এটিই এর দাবী। এসব দিক যদি মেনে চলা হয় কেবল তবেই সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

স্মরণ রাখবেন, অন্যায় ও অবিচার বিরাজমান থাকলে কখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। অতএব কোন দেশ যদি সকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে এবং অন্য আরেক দেশকে আক্রমণ করে ও অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ করায়ত্ত করতে চায়,তাহলে এই নিষ্ঠুরতা থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর অবশ্যই পদক্ষেপ নেয়া উচিত। কিন্তু এ কাজে তাদেরকে সর্বদা ন্যায় নীতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষানুসারে যে সব পরিস্থিতিতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় তা সবিস্তারে কুরআনের ৪৯ নম্বর সূরার ১০ নম্বর আয়াতে উল্লেখিত আছে। পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়, যখন দু'টি জাতি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয় আর বিবাদ যুদ্ধে পর্যবসিত হয়, তখন অন্যান্য সরকারের উচিত তাদেরকে সংলাপ এবং দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট আলোচনার প্রতি জোরালোভাবে আহ্বান জানানো, যেন তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তি করে একটি সন্ধি বা মিমাংসায় উপনীত হতে পারে। তবে যদি কোন এক পক্ষ চুক্তির শর্ত মেনে না

নেয় এবং যুদ্ধ আরম্ভ করে, তাহলে আগ্রাসীকে থামানোর জন্য অন্য দেশগুলোর সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করা উচিত। আগ্রাসী জাতি যখন পরাজিত হয় এবং সে পারস্পরিক আলোচনায় বসতে সম্মত হয়, তখন সকল পক্ষের এমন একটি মিমাংসায় উপনীত হবার জন্য কাজ করা উচিত যা দীর্ঘমেয়াদী শান্তি এবং মিমাংসার পথ সুগম করবে। কোন জাতিকে শেকলাবদ্ধ করার জন্য তার বিরুদ্ধে কঠোর ও অন্যায় কোন শর্ত আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এর দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল হলো অস্থিরতা, যা আরো বীভৎস রূপধারণ করবে এবং বিস্তৃত হবে। পরিণামে ছড়িয়ে পড়বে আরও নৈরাজ্য।

তৃতীয় কোন সরকার যদি বিবদমান দুই পক্ষের মাঝে মিমাংসার চেষ্টা করে, তার উচিত পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করা। আর এই নিরপেক্ষতা তখনও বিদ্যমান থাকতে হবে যখন কোন এক পক্ষ এর বিরুদ্ধাচরণ করে। এমন পরিস্থিতিতেও তৃতীয় পক্ষের কোন প্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করা উচিত নয় বা প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে অথবা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে কোন কাজ করা উচিত নয়। সকল পক্ষকে তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। শান্তি প্রক্রিয়ায় যেসব দেশ ন্যায়বিচারের দাবী পূরণের লক্ষ্যে মধ্যস্থতা করে, তাদের উচিত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করা বা অন্যায়ভাবে উভয় দেশের কাছ থেকে অন্যায্য সুযোগ সুবিধা আদায় বা এ লক্ষ্যে অন্যায়ভাবে চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকা। অন্যায় হস্তক্ষেপ বা কোন পক্ষের উপর অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করা উচিত নয়। কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করার সুযোগ নেয়া উচিত নয়। দেশগুলোর বিরুদ্ধে অনাবশ্যক এবং অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত নয়। কেননা এটি একদিকে সঠিকও নয় আবার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক উন্নয়নে এটি সহায়ক ভূমিকাও পালন করে না।

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে আমি এ বিষয়গুলো অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। এক কথায়, আমরা যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বৃহত্তর স্বার্থ অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থকে ত্যাগ করতে হবে এবং এর পরিবর্তে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত গড়তে হবে পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার উপর। অন্যথায়, আপনারা অনেকেই এ বিষয়ে একমত হবেন, অদূর ভবিষ্যতে নতুন নতুন জোট ও ব্লক তৈরি হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এভাবে বলা উচিৎ, এ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে যার ফলশ্রুতিতে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে এটি এক বিপুল ধ্বংসযজ্ঞের রূপ লাভ করতে পারে। এরকম

ধ্বংসযজ্ঞ ও যুদ্ধের কুফল নিশ্চিতভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রকাশিত হতে থাকবে। তাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উচিত, প্রকৃত ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। সে সব মহৎ লক্ষ্যে কাজ করা উচিত যা আমি ইতোমধ্যে বর্ণনা করে এসেছি। এমনটি করলে জগদ্বাসী সবসময় আপনাদের এই মহান প্রচেষ্টাকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখবে। আমি দোয়া করি, আমার এই আশা যেন বাস্তব রূপ লাভ করে (আমীন)।

আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাদেরকে আবারো ধন্যবাদ।

আমাদের রীতি অনুসারে অনুষ্ঠানের শেষে আমরা সাধারণতঃ সমবেতভাবে নিরবে দোয়া করে থাকি। তাই আমি এখন দোয়া পরিচালনা করবো আর আহ্‌মদীগণ আমাকে অনুসরণ করবেন। আপনারা সবাই, আমাদের অতিথিবৃন্দ, নিজ রীতি অনুসারে প্রার্থনা করতে পারেন।

শান্তির চাবিকাঠি –
বিশ্ব ঐক্য

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট

ব্রাসেল্‌স, বেলজিয়াম, ২০১২

হযরত খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.)-কে অভ্যার্থনা জানাচ্ছেন ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট, মার্টিন সুল্‌জ

হুযূর (আই.) ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে ভাষণদানের পর দোয়া পরিচালনা করেন। তাঁর ডানে বসা: ড. চার্লস তানোক (এমইপি, যুক্তরাজ্য), বামে: রফিক হায়াত (যুক্তরাজ্য আহমদীয়া জামা'তের ন্যাশনাল আমীর)
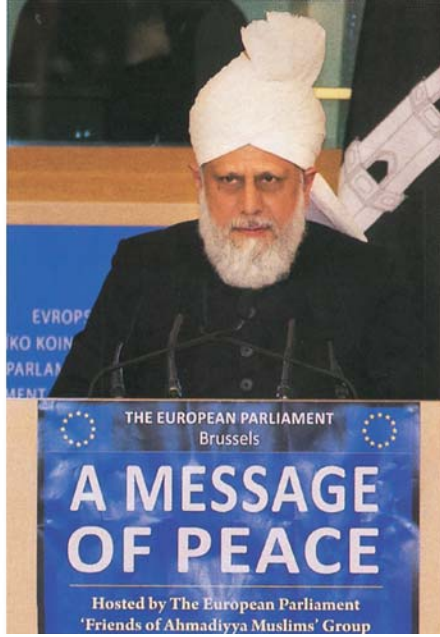
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.) ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে ভাষণে কি-নোট প্রদান করছেন

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে হযরত খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.)-এর সাথে প্রেস কনফারেন্স।
হুযূর (আই.)-এর পাশে বসা ড. চার্লস তানোক (এমইপি যুক্তরাজ্য এবং
ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের চেয়ার ও আহমদীয়া মুসলিম গ্রুপের বন্ধু
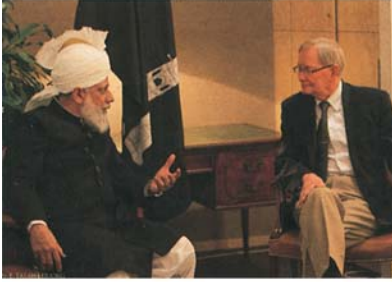
হুযূর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করছেন আহমদীয়া মুসলিম গ্রুপের বন্ধু তুন্নি কেলাম (এমইপি এস্টনিয়া এবং ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস-চেয়ার)

হুযূর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করছেন ফিল বেনীউন (এমইপি ওয়েষ্ট মিডল্যান্ডস এন্ড মেম্বার অব ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট'স সাউথ এশিয়া ডেলিগেশন)

পটভূমি

২০১২ সালের ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান এবং মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পঞ্চম খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) ব্রাসেল্‌স-এ অবস্থিত ইউরোপীয় পার্লামেন্টে প্রথমবারের মত সফর করেন, যেখানে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সাড়ে তিন শতাধিক অতিথির ভরা সমাবেশে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল ড. চার্লস ট্যানক (এম.ই.পি-যুক্তরাজ্য)-এর সভাপতিত্বে নবগঠিত সর্বদলীয় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট গ্রুপ "ফ্রেন্ডস অফ আহমদীয়া মুসলিমস"। এটি এম.ই.পি-দের একটি সর্বদলীয় এবং সর্ব-ইউরোপীয় গ্রুপ যা ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে তুলে ধরা এবং ইউরোপ ও বাকি বিশ্বে তাদের পক্ষে কাজ করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। সফরকালে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বেশ কয়েকবার পার্লামেন্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন:

ড. চার্লস ট্যানক (এম.ই.পি.-যুক্তরাজ্য)- সদস্য, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি; সদস্য, মানবাধিকার সাব-কমিটি, সহ-সভাপতি, ন্যাটো পার্লামেন্টারী এ্যাসেম্বলীর সাথে সম্পর্ক বিষয়ক পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল এবং সভাপতি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডস্ অফ আহমদীয়া মুসলিম গ্রুপ।

টুনে কেলাম (এম.ই.পি.-এস্টোনিয়া)- সদস্য, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি; সদস্য, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সাব কমিটি এবং সহ-সভাপতি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডস্ অফ আহমদীয়া মুসলিম গ্রুপ।

ক্লদ মোরায়েস (এম.ই.পি.-যুক্তরাজ্য)- সহ-সভাপতি, আরব উপদ্বীপের সাথে সম্পর্ক বিষয়ক প্রতিনিধি দল; সদস্য, নাগরিক অধিকার, বিচার ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক কমিটি; উপ-নেতা, ইউরোপীয় পার্লামেন্টারী লেবার পার্টি এবং সহ-সভাপতি ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডস্ অফ আহমদীয়া মুসলিম গ্রুপ।

বারবারা লখবিহলার (এম.ই.পি.-জার্মানী)- সভাপতি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট মানবাধিকার সাব-কমিটি।

জীন ল্যাম্বার্ট (এম.ই.পি.-যুক্তরাজ্য)- সভাপতি, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট দক্ষিণ এশিয়া প্রতিনিধিদল।

ফিল বেনিয়ন (এম.ই.পি.-যুক্তরাজ্য)- সদস্য, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট দক্ষিণ এশিয়া প্রতিনিধিদল এবং সভাপতি, লিবারাল ডেমোক্র্যাট ইউরোপীয় গ্রুপ।

৪ঠা ডিসেম্বর মূল অনুষ্ঠান তথা হুযূর (আই.)-এর মূল বক্তৃতার পূর্বে প্রেস রুমে একটি আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের সাংবাদিক ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতিতে চল্লিশ মিনিট দীর্ঘ এ সাংবাদিক সম্মেলনে হুযূর (আই.) সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। বিশ্বে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে বি.বি.সি.-র এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন, "ইসলামের শান্তির বাণী একটি সার্ব-জনীন বাণী, যার কারনে আমাদের মূলমন্ত্র "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো 'পরে" "(Love for all, hatred for none)" এক স্প্যানিশ মিডিয়া প্রতিনিধির এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন যে, সকল বড় বড় ধর্মই তাদের আদি রূপে শান্তির বাণী শিক্ষা দিয়েছে আর তাই প্রকৃত মুসলমানগণ সকল নবীর উপর বিশ্বাস রাখেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক নবীই এ বার্তা নিয়ে এসেছেন যে, খোদা এক। মাল্টার এক মিডিয়া প্রতিনিধির এক প্রশ্নের উত্তরে হুযূর (আই.) বলেন যে, আহমদী মুসলমানদের দায়িত্ব হল মানবজাতিকে খোদাতা'লার নিকটবর্তী করা এবং পৃথিবীর মানুষকে একে অন্যের অধিকার রক্ষার দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন করা।

মূল অনুষ্ঠানের সময় সভাস্থল দর্শকে পরিপূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডস্ অফ আহমদীয়া মুসলিমস্ গ্রুপের সভাপতি এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ মঞ্চে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-কে স্বাগত জানান। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট মার্টিন শূল্য এম.ই.পি. হুযূর (আই.)-এর মূল বক্তৃতার পূর্বে কয়েকজন এম.ই.পি. দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রচারিত শান্তিপূর্ণ ইসলামের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধের কথা ব্যক্ত করেন। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডস্ অফ আহমদীয়া মুসলিম গ্রুপের সভাপতি ড. চার্লস ট্যানক এম.ই.পি. বলেন "আহমদী মুসলমানগণ বিশ্বে সহিষ্ণুতার এক স্বাগত উদাহরণ"। আমরা এখানে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মসিলিম জামা'তের প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.)-এর ঐতিহাসিক মূল বক্তৃতাটি পেশ করছি।

শান্তির চাবিকাঠি –বিশ্ব ঐক্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম- আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বারবার দয়াকারী।

সকল সম্মানিত অতিথিবর্গ!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু- আপনাদের সকলের উপর শান্তি এবং আল্লাহর আশীষ অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি এ অনুষ্ঠানের আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আমাকে এখানে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে আপনাদের সকলকে সম্বোধন করে কিছু বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি আরো ধন্যবাদ দিতে চাই সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে যারা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত রয়েছেন এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে যারা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনেক বড় কষ্ট স্বীকার করেছেন।

যারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বা সম্প্রদায়-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত এমনকি তাঁরা যারা তুলনামূলকভাবে কম ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কিন্তু একক আহমদীদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ রয়েছে, তারা এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হয়ে থাকবেন যে, একটি সম্প্রদায় হিসেবে আমরা সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। আর নিশ্চিতভাবে আমাদের সাধ্যের মধ্যে আমরা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা করে থাকি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান হিসেবে যখনই সুযোগ আসে আমি নিয়মিত এ বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করে থাকি। আমি যে শান্তি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বিষয়ে কথা বলে থাকি, তা এজন্য নয় যে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে কোন নতুন শিক্ষার আগমন ঘটেছে। যদিও এটি নিশ্চিতভাবে সত্য যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা, প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকল কাজের মূল সেই শিক্ষার মধ্যে নিহিত যা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট আবির্ভূত হয়েছিল।

মহানবী (সা.)-এর যুগের পরবর্তী চৌদ্দশত বছরে, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর আনীত পবিত্র শিক্ষা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দীর্ঘদিন ভুলে বসেছিল। তাই প্রকৃত ইসলামের পুনর্জাগরনের উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে প্রেরণ করেন। আমি যখন বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসার প্রসঙ্গে ইসলামের শিক্ষার বিষয়ে কথা বলি, তখন আমার অনুরোধ যে, এ বিষয়টি আপনারা আপনাদের দৃষ্টিপটে রাখবেন।

আমার আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তার' একাধিক দিক রয়েছে। যেভাবে এর প্রতিটি আঙ্গিক নিজ সত্ত্বায় গুরুত্ব বহন করে, একই সাথে যেভাবে এ আঙ্গিকগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ সমাজের শান্তির মূল ভিত্তি পরিবার বা ঘরের শান্তি ও সৌহার্দ্য। ঘরের পরিবেশের প্রভাব ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর প্রভাব স্থানীয় এলাকার শান্তির উপর পড়ে, যা আবার পর্যায়ক্রমে বৃহত্তর শহর বা নগরীর শান্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি ঘরে অশান্তি থাকে, তবে তা স্থানীয় এলাকার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং তা আবার শহর বা নগরের উপর প্রভাব ফেলবে। একই ভাবে শহর বা নগরীর অবস্থা পুরো দেশের শান্তির উপর প্রভাব ফেলবে এবং শেষ পর্যন্ত জাতির অবস্থা পুরো অঞ্চল বা পুরো বিশ্বের শান্তি ও সম্প্রীতিকে প্রভাবিত করবে। অতএব এটি স্পষ্ট যে যদি আপনি শান্তির কোন একটি আঙ্গিক নিয়েও আলোচনা করতে চান, তবে তার পরিধি সীমিত থাকবে না, বরং তা ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে, আমরা দেখে থাকি যে, যেখানে শান্তির অভাব রয়েছে, সেখানে বিদ্যমান সমস্যা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার যে আঙ্গিকটি লংঘিত হয়েছে তার ভিত্তিতে বিষয়টি সুরাহা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এ বিষয় মাথায় রাখলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এ বিষয়গুলোর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে এদের বিস্তারিত সমাধান প্রদান করার জন্য আমাদের হাতে যা রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সময় প্রয়োজন। তথাপি আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অন্ততঃ কিছু দিক উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো।

আধুনিক পৃথিবীতে আমরা লক্ষ্য করি যে, ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং বিশ্বে বিদ্যমান বিশৃংখলা ও অস্থিরতার জন্য এ ধর্মকে দায়ী করা হয়। যদিও ইসলাম শব্দটির অর্থই 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' তবু এরূপ অভিযোগ করা হয়ে থাকে। উপরন্তু, ইসলাম সেই ধর্ম যা শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে এবং এটি অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট

কতকগুলো বিধি-বিধান প্রদান করেছে। ইসলামের প্রকৃত ও শান্তিপূর্ণ শিক্ষার একটি চিত্র আপনাদের সামনে উপস্থাপনের বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমি বিশ্বের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। আমি নিশ্চিত যে, আপনারা ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে সম্যক অবহিত আছেন। তারপরও আমি এর অবতারণা করবো, যেন আমি যখন ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্যের শিক্ষার আলোচনা করবো তখন আপনাদের দৃষ্টিপটে এ বিষয়গুলো থাকে। আমরা সকলে এ বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন ও স্বীকার করি যে আজকের পৃথিবী এক বিশ্ব পল্লীতে পরিণত হয়েছে, আমরা সকলে নানাভাবে সংযুক্ত, তা আজকের দিনের আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমেই হোক অথবা মিডিয়া বা ইন্টারনেট বা অন্যান্য বিবিধ মাধ্যমেই হোক। এ সমস্ত কারণে পূর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে বিশ্বের দেশগুলো একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। আমরা দেখি যে গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলোতে সকল গোত্র, ধর্ম ও জাতিসত্ত্বার মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে এবং একত্রে বসবাস করছে। সত্যিই আজ অনেক দেশে ভিন্ন দেশ হতে এসে অভিবাসন গ্রহণকারী জনসংখ্যা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অভিবাসন গ্রহণকারীরা এমনভাবে সমাজের মধ্যে গ্রথিত হয়ে গেছে যে সরকার বা স্থানীয় জনগণের পক্ষে তাদেরকে সরানো এখন অতীব দুস্কর এমনকি অসম্ভব। যদিও অভিবাসনের সুযোগকে সংকীর্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপও করা হয়েছে। তথাপি এমন অনেক উপায় রয়ে গেছে যার মাধ্যমে এক দেশের নাগরিক অন্য দেশে প্রবেশ করতে পারে। বস্তুতঃ অবৈধ অভিবাসনকে যদি বাদও দেয়া হয়, আমরা দেখি যে কতকগুলো আন্তর্জাতিক আইন বিদ্যমান যা যথার্থ কারণে যারা দেশত্যাগে বাধ্য হয় তাদের সপক্ষে কাজ করে।

আমরা আরো লক্ষ্য করি যে, গণ-অভিবাসনের ফলে কোন কোন দেশে অস্থিরতা ও টানাপোড়েন ছড়িয়ে পড়ছে। এর জন্য উভয় পক্ষই দায়ী – অভিবাসী এবং স্থানীয় জনগণ। একদিকে অভিবাসীগণের একাংশ তাদের নতুন দেশের সমাজের সাথে একাত্ম হতে অস্বীকৃতি জানিয়ে স্থানীয়দের উস্‌কে দেয়; আর অপরদিকে স্থানীয়দের একাংশের মাঝে সহিষ্ণুতা ও উন্মুক্ত হৃদয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সময়ে সময়ে এ ঘৃণা বাড়তে বাড়তে খুবই মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয়। বিশেষ করে, পাশ্চাত্য জগতে কতক মুসলমানের বিশেষত অভিবাসীগণের নেতিবাচক আচরণের কারণে স্থানীয়দের ঘৃণা ও শত্রুতা অনেক সময় ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়। এ ক্ষোভ এবং প্রতিক্রিয়া কেবল ক্ষুদ্র মাত্রায় সীমিত নয়, বরং চরম পর্যায়ে উপনীত হতে পারে এবং হয়েও থাকে, আর এ কারণেই পাশ্চাত্য নেতৃবর্গ নিয়মিতভাবে এ সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রেখে থাকেন। সুতরাং আমরা দেখি যে, কখনো জার্মান চ্যান্সেলর মুসলমানদের জার্মানীর সাথে একাত্ম হওয়ার বিষয়ে

কথা বলছেন; কখনো বা আমরা দেখি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদের সমাজে একাত্ম হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন; আর কোন কোন দেশের নেতৃবৃন্দ তো মুসলমানদের হুঁশিয়ারী পর্যন্ত দিয়েছেন। বিদ্যমান সংঘাতসমূহের ভিতরের অবস্থার গুরুতর অবনতি যদি নাও হয়ে থাকে, অন্ততঃ উদ্বেগজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ বিষয়গুলো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং শান্তিকে বিনষ্ট করার পথে নিয়ে যেতে পারে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে এমন সংঘাতের প্রভাব পশ্চিমা জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পুরো পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে, বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের উপর এর ফলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জগতের মধ্যে সম্পর্কের গুরুতর অবনতি হবে। অতএব এ পরিস্থিতির উন্নয়ন ও শান্তির বিস্তারের জন্য সকল দলকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সরকারগুলোকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হবে যা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করে, যেগুলোর মাধ্যমে অন্যের অনুভূতিতে কোন প্রকার আঘাত বা তাদের কোন প্রকার ক্ষতি করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা উচিত।

অভিবাসীগণের বিষয়ে বলবো যে, স্থানীয় লোকদের সাথে একাত্ম হওয়ার সদিচ্ছা নিয়েই তাদের দেশে প্রবেশ করতে হবে, আর অপরপক্ষে স্থানীয়দের হৃদয় উন্মুক্ত করার জন্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। উপরন্ত মুসলমানদের উপর কেবল কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করলেই তা শান্তির পথে নিয়ে যাবে না, কেননা কেবল এর দ্বারা মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারার পরিবর্তন করা যায় না। এটি কেবল মুসলমানদের বিষয় না, বরং যখনই কোন ব্যক্তিকে তার ধর্ম বা বিশ্বাসের জন্য জোরপূর্বক অবদমিত করা হয়, তখন এর এক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় যার ফলে শান্তি গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হবে। যেমনটি আমি ইতোমধ্যে বলেছি, আমরা লক্ষ্য করি যে, কোন কোন দেশে সংঘাত সমূহ বাড়ছে, বিশেষ করে স্থানীয় মানুষ এবং মুসলিম অভিবাসীদের মধ্যে। এটা স্পষ্ট যে উভয় পক্ষ ক্রমে ক্রমে পূর্বাপেক্ষা কম সহনশীল হয়ে উঠছে এবং একে অপরকে জানার বিষয়ে একরূপ অনীহা রয়েছে। ইউরোপীয় নেতৃবর্গকে এটা মেনে নিতে হবে যে এটিই বাস্তবতা এবং উপলব্ধী করতে হবে যে পারস্পরিক ধর্মীয় শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠায় তাদের একটি দায়িত্ব রয়েছে। এটি অত্যাবশ্যকীয়, যেন প্রত্যেক ইউরোপীয় দেশের অভ্যন্তরে এবং ইউরোপীয় ও মুসলমান দেশসমূহের মাঝে সৌহার্দ্যের এক পরিবেশ গড়ে উঠে এবং বিশ্বের শান্তি যেন চূর্ণ বিচূর্ণ না হয়।

আমি বিশ্বাস করি যে এসব সংঘাত ও বিভক্তির কারণ কেবল ধর্ম বা বিশ্বাস নয় এবং এটি কেবল পাশ্চাত্য ও মুসলমান দেশসমূহের পার্থক্যের প্রশ্ন নয়।

প্রকৃতপক্ষে এ বিরোধের গোড়ার কারণের মধ্যে বড় একটি হল বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সংকট। যখন কোন মন্দা বা ঋণ সংকট (ক্রেডিট ক্রাঞ্চ) ছিল না তখন কোন দিন কেউ অভিবাসীদের আগমন নিয়ে পরোয়া করে নি; মুসলিম হোক বা অমুসলিম বা আফ্রিকান। কিন্তু, বর্তমান পরিস্থিতি ভিন্ন আর সে কারণেই এসব হচ্ছে, এটি এমনকি ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করেছে এবং এর ফলে কতক ইউরোপীয় জাতির মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও তিক্ততা দিন দিন বেড়ে চলেছে। সর্বত্র নৈরাশ্যের অবস্থা দৃশ্যমান হচ্ছে।

ইউরোপীয় দেশগুলোর একটি মহান অর্জন হল ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন গঠন করা, কেননা এর মাধ্যমে মহাদেশটি একতাবদ্ধ হয়েছে অতএব, আপনাদের উচিত হবে এ একতাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে একে অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। সাধারণ জনগণের মনে বিদ্যমান উৎকণ্ঠা ও ভীতিসমূহকে অবশ্যই দূর করতে হবে। একে অপরের সমাজকে রক্ষার খাতিরে আপনাদের উচিত হবে একে অপরের যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ মেনে নেয়া, আর অবশ্যই প্রতিটি দেশের জনগণের কেবল যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত দাবিই উত্থাপন করা উচিত।

স্মরণ রাখবেন যে ইউরোপের শক্তি এর একতাবদ্ধ ও একত্রে এক হয়ে থাকার মধ্যে নিহিত। এরূপ একতা কেবল এখানে ইউরোপে আপনাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না, বরং বৈশ্বিক পর্যায়ে এ মহাদেশের শক্তি ও প্রভাব বজায় রাখার কারণ হবে। বস্তুতঃ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলতে গেলে, আমাদের প্রচেষ্টা এই হওয়া উচিত যে পুরো পৃথিবী যেন একতাবদ্ধ হয়। মুদ্রার দিক থেকে বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। মুক্ত ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশ্বের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত আরও অভিবাসনের বিষয়ে সুসংহত ও বাস্তবমুখী নীতিসমূহ গড়ে তোলা উচিত, যেন বিশ্ব একতাবদ্ধ হতে পারে। সারকথা হল এই যে, সকল দেশের একে অপরের সাথে সহযোগিতা করা উচিত যেন বিভক্তির স্থলে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি এ ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয় তবে শীঘ্রই দেখা যাবে যে বিদ্যমান সংঘাতসমূহের অবসান হবে এবং এর স্থলে শান্তি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হবে, এ শর্তসাপেক্ষে যে, প্রকৃত ন্যায়ের চর্চা করা হয় এবং প্রত্যেক দেশ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করে। আমাকে গভীর অনুতাপের সাথে বলতে হচ্ছে যে, যদিও এটি একটি ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী দেশগুলো নিজেদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় নি। যদি তারা একে অপরের সহযোগিতা করতো এবং একতাবদ্ধ হত, তবে তাদেরকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ ও চাহিদা পূরণে সর্বদা পশ্চিমা সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হত না।

এ কথাগুলোর সাথে আমি এখন বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রথমতঃ ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও প্রাথমিক একটি শিক্ষা এই যে একজন প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কথা ও কাজ থেকে অপর সকল শান্তিকামী মানুষ নিরাপদ থাকে। এটি একজন মুসলমানের সেই সংজ্ঞা যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রদান করেছেন। এ মৌলিক ও অনুপম সুন্দর নীতি শোনার পরে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপনের আর কোন অবকাশ থাকে কি? নিশ্চয় না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র যারা নিজ কথা ও কাজে অন্যায় ও বিদ্বেষ ছড়ায় তারাই শাস্তি প্রদানের যোগ্য। এভাবে, স্থানীয় পর্যায় থেকে বৈশ্বিক পর্যায়ে যদি সকল পক্ষ এ স্বর্ণালী নীতির গন্ডীর মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা দেখবো যে কখনো ধর্মীয় বিশৃংখলার উদ্ভব হবে না। কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতার উদ্ভব হবে না আর লালসা ও ক্ষমতালিপ্সা থেকে উদ্ভুত বিশৃংখলাও সৃষ্টি হবে না। যদি এ প্রকৃত ইসলামী নীতিসমূহ অনুসরণ করা হয়, তাহলে দেশগুলোর অভ্যন্তরে জনসাধারণ একে অপরের অধিকার ও অনুভূতির বিষয়ে যত্নবান হবে এবং সরকারগুলো সকল নাগরিককে রক্ষায় তাদের দায়িত্ব পালন করবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রত্যেক রাষ্ট্র একে অপরের সাথে প্রকৃত সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির স্পৃহা নিয়ে সমবেতভাবে কাজ করবে।

আরেকটি মূলনীতি যা ইসলাম শেখায় তা এই যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে, এটা আবশ্যক যে সকল পক্ষ সর্বদা কোন প্রকারের দম্ভ বা অহমিকা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে। মহানবী (সা.) তার একটি বিখ্যাত উক্তিতে এ বিষয়টিই উপস্থাপন করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে, কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কোন কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপরও কোন শ্বেতাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি অন্য কোন জাতির উপর কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির কোন মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আফ্রিকান বা এশীয় বা বিশ্বের অন্য কোন অংশের মানুষের। জাতি, বর্ণ ও গোত্রের এ বৈচিত্র্য কেবল আমাদের পরিচিত ও শনাক্তকরণের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

সত্য এই যে, আধুনিক বিশ্বে আমরা সকলে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। আজ এমনকি ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ শক্তিগুলো অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে টিকে থাকতে পারবে না। আফ্রিকান দেশগুলো বিচ্ছিন্ন থেকে সমৃদ্ধি লাভের আশা করতে পারে না, আর এশীয় দেশগুলোর পক্ষেও বিশ্বের কোন অংশের দেশ বা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে আপনার সাদরে স্বাগত জানাতে হবে। গত কয়েক বছরের ইউরোপের তথা বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট যেভাবে

কম-বেশি বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করেছে তা থেকে বিশ্ব আজ কিভাবে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত তা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তদুপরি বিজ্ঞানে অগ্রগতির জন্য বা অন্য কোন দক্ষতায় উন্নতি করার জন্য দেশগুলোর একে অপরের সাহায্য সহযোগিতার আবশ্যকতা রয়েছে।

আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এ পৃথিবীর মানুষকে, তারা আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া বা অন্য কোন স্থান থেকে আসুন না কোন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ অসাধারণ মেধাগত যোগ্যতাসমূহ প্রদান করেছেন। যদি সকল পক্ষ তাদের নিজ নিজ খোদা-প্রদত্ত যোগ্যতাসমূহ যথাসাধ্য বিশ্ব মানবতার উন্নতি কল্পে প্রয়োগ করে, তাহলে আমরা দেখবো যে, বিশ্ব এক শান্তির নীড়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু, যদি উন্নত দেশগুলো স্বল্পোন্নত, বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নতি-অগ্রগতিকে দমন করতে চায় আর সে সব দেশের উর্বর ও মেধাবী মস্তিষ্কের ব্যক্তিদের সুযোগ না দেয়, তাহলে সন্দেহ নাই যে, অস্থিরতা বিস্তার লাভ করবে এবং এর ফলে সৃষ্ট অস্থিতিশীলতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করবে।

শান্তির প্রসারে ইসলামের আরেকটি নীতি হল অন্যের প্রতি কোন অন্যায়-অবিচার বা তাদের কোন অধিকার হরণ হলে আমাদের তা সহ্য করা উচিত না। ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের নিজেদের অধিকারের হরণ মেনে নিই না, অন্যদের ক্ষেত্রেও এটি আমাদের মেনে নিতে প্রস্তুত থাকা উচিত না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যখন প্রতিশোধ গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তখন তা প্রথম সীমালঙ্ঘণের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু, যদি ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে সংশোধনের অবকাশ থাকে তবে ক্ষমার পথটি বেছে নেয়া উচিত। প্রকৃত এবং সবচেয়ে অগ্রগণ্য উদ্দেশ্য সব সময় হওয়া উচিত সংশোধন, সমঝোতা ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা। অথচ, বাস্তবে আজ কি ঘটছে? যদি কেউ কোন ভুল বা অন্যায় করে থাকে, তাহলে আক্রান্ত পক্ষ এমনভাবে প্রতিশোধ নিতে চায় যা সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যের ঊর্ধ্বে এবং যা মূল সংঘটিত অন্যায়ের চাইতে অনেক গুরুতর।

আজ ঠিক এ বিষয়টিই ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ঘনায়মান সংঘাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বড় শক্তিগুলো সিরিয়া, লিবিয়া বা মিনারের পরিস্থিতি নিয়ে খোলাখুলিভাবে তাদের ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে; যদিও এ বিতর্ক করা যায় যে এগুলো মূলত ছিল তাদের আভ্যন্তরীণ সমস্যা অথচ তাদেরকে (বৃহৎ শক্তিগুলোকে) ফিলিস্তিনী জনগণের বিষয়ে উদ্বিগ্ন বা অন্ততঃ তেমনভাবে উদ্বিগ্ন মনে হয় না। এই ডবল স্ট্যান্ডার্ড বা দ্বৈত আচরণের উপলব্ধি মুসলমান দেশগুলোর জনগণের অন্তরে বৃহৎ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্বেষের কারণ হচ্ছে। এ ক্রোধ এবং বিদ্বেষ অত্যন্ত ভয়াবহ এবং যে কোন মুহূর্তে এটি উপচে পড়ে বিস্ফোরিত হতে পারে। তার ফলাফল কি হবে? উন্নয়নশীল বিশ্বে কতটুকু

ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হবে? তারা কি এমনকি নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে? উন্নত দেশগুলো কতটা প্রভাবিত হবে? কেবলমাত্র খোদাই এরূপ প্রশ্নের উত্তর জানেন। আমি এর উত্তর দিতে পারি না। আর কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। যেটুকু আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি তা এই যে বিশ্বের শান্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, আমি কোন নির্দিষ্ট একক দেশের অনুকূলে বা পক্ষে কথা বলছি না। আমি যা বলতে চাই তা হল সকল প্রকার নিষ্ঠুরতা, তার অস্তিত্ব যেখানেই হোক না কেন, নির্মূল করতে হবে তা ফিলিস্তিনীদের দ্বারা সংঘটিত হোক না কেন, বা ইসরায়েলীদের বা অপর কোন দেশের মানুষের দ্বারা। নিষ্ঠুরতাসমূহকে অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, কেননা যদি এগুলোকে ছড়ানোর সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে সারা পৃথিবীতে ঘৃণার আগুন এভাবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে যে মানুষ অচিরেই বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটজনিত সমস্যাবলীকে ভূলে যাবে। এর চাইতে বহুগুণ ভীতিপ্রদ এক পরিস্থিতির তারা মুখোমুখি হবে। এত বড় সংখ্যায় প্রাণহানি হবে যে, আমরা তা চিন্তা বা কল্পনাও করতে পারি না।

সুতরাং এটি ইউরোপীয় দেশগুলো যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হয়েছে, তাদের দায়িত্ব যে, তারা তাদের অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এতদুদ্দেশ্যে তাদেরকে ন্যায়ের দাবি পূরণ করতে হবে এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আন্তরিক হতে হবে। ইসলাম সবসময় ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতহীন আচরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। এটি শিক্ষা দেয় যে কোন পক্ষকেই বৈষম্য মূলক সুবিধা বা অন্যায় সুযোগ দেয়া উচিত না। এমন হওয়া উচিত যে, অন্যায়কারী জানবে যে, যদি কোন দেশের প্রতি সে অন্যায় পদক্ষেপ গ্রহণে উদ্যত হয়, সেই দেশের আকার বা মর্যাদা নির্বিশেষে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাকে তা করতে দিবে না। যদি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সুবিধা ভোগকারী রাষ্ট্রসমূহ এবং ঐ সকল দেশ যা বৃহৎ শক্তিগুলোর, এমনকি উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর প্রভাবাধীন রয়েছে সকলে যদি এ নীতি অবলম্বন করে তবে এবং কেবল তখনই, শান্তির উদ্ভব হতে পারে।

উপরন্তু কেবল যদি ঐ সকল রাষ্ট্র, যারা জাতিসংঘে ভেটো প্রদানের অধিকার রাখে, যদি অনুধাবন করে যে তাদের আচরণের দায়ভার তাদেরকে নিতে হবে, তবেই প্রকৃত অর্থে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বরং আমি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলবো যে, ভেটো প্রদানের অধিকার কখনো শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিতে বা এর পথকে সুগম করতে পারে না। কেননা স্পষ্টতই সকল দেশের মর্যাদা সমান নয়। ইতিপূর্বে এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকদের উদ্দেশ্য বক্তব্য প্রদান কালেও আমি এ বিষয়টি

চিহ্নিত করেছি। যদি আমরা জাতিসংঘের ভোট প্রদানের ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে আমরা দেখি যে ভেটো ক্ষমতা যে সব সময় অত্যাচারিতকে বা যারা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করছে তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এমনটি নয়। বস্তুতঃ আমরা দেখেছি যে, কতক সময়ে ভেটো ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিষ্ঠুরতাকে প্রতিহত করার বদলে সাহায্য সমর্থন করা হয়েছে। এটি কোন গোপন বা অজানা বিষয় নয়; অনেক বিশে- ষক এ বিষয়ে খোলাখুলি লিখে বা বলে থাকেন।

আরেকটি সুন্দর নীতি যা ইসলাম শেখায় তা এই যে, সমাজে শান্তির জন্য সততা ও ন্যায়বিচারের নীতির উপর ক্রোধকে প্রাধান্য লাভের সুযোগ না দিয়ে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক একে দমন করা। ইসলামের সূচনা লগ্নের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রকৃত মুসলমানগণ সদা এ নীতির উপর চলেছেন; আর যে কেউ তা করেন নি তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছেন। তথাপি, আজ দুর্ভাগ্যক্রমে সব সময় এ চিত্র পরিলক্ষিত হয় না। এমন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে সেনা বাহিনীসমূহ বা সৈন্যরা, যাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় মোতায়েন করা হয়, এমন আচরণ করে থাকেন যা তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ কোন কোন দেশে বিদেশী সৈন্যরা তাদের হাতে নিহতদের মরদেহের সাথে অত্যন্ত অসম্মানজনক ও বীভৎস আচরণ করেছে। এভাবে কি শান্তি স্থাপিত হতে পারে? এরূপ আচরণের প্রতিক্রিয়া কেবল আক্রান্ত দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, বরং বিশ্ব জুড়ে প্রকাশিত হয়। মুসলিম চরমপন্থীরা এর সুযোগ নেয় এবং বিশ্বের শান্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। যদিও এ (প্রতিক্রিয়া) ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী।

ইসলাম শেখায় যে শান্তি কেবল তখনই প্রতিষ্ঠা সম্ভব যখন অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী উভয়কে এমনভাবে সহায়তা করা হয় যা সম্পূর্ণ পক্ষপাতমুক্ত, গোপন স্বার্থ বর্জিত এবং সকল প্রকার শত্রুভাবাপন্নতা থেকে মুক্ত। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় সকল পক্ষকে সমান অবস্থান এবং সুষম ক্ষেত্র (উয়ঁধষ চষধঃভড়ৎস ধহফ ঢ়ষধুরহম ভরবষফ) তৈরি করে দেয়ার মাধ্যমে।

যেহেতু সময় সীমিত, আমি আর মাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, আর তা এই যে, ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, অন্যের ধন সম্পদের দিকে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে দেখা উচিত না। যা অন্যের তার প্রতি তোমাদের লোভাতুর অনুভূতি থাকা উচিত নয়, কেননা এটিও শান্তি পদদলিত হওয়ার অন্যতম কারণ। যদি সম্পদশালী দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ধন-সম্পদ তাদের (ধনী দেশগুলোর) নিজ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আহরণ ও ব্যবহার করতে চায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই, অস্থিতিশীলতা ছড়িয়ে পড়বে। যেখানে যথাযথ উন্নত দেশগুলো

তাদের সেবার বিনিময়ে একটি ছোট ও ন্যায়সঙ্গত ও অংশ তাদের নিজ চাহিদা পূরণের জন্য নিতে পারে, কিন্তু সম্পদের সিংহভাগ এ সকল অনুন্নত দেশের মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের সহায়তাকল্পে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। তাদেরকে সমৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ দেয়া উচিত এবং উন্নত বিশ্বের সমমানের উন্নীত হওয়ার প্রয়াসে তাদের সহযোগিতা করা উচিত, কেননা তখনই, এবং কেবল তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যদি সেসব দেশের শাসকগণ সৎ না হয়ে থাকে, তবে পাশ্চাত্য বা উন্নত দেশগুলোর উচিত সাহায্য প্রদান করে স্বয়ং সেই দেশের উন্নয়নের তদারকী ও তত্ত্বাবধান করা।

আরো অসংখ্য বিষয় আছে যেগুলো আমি আলোচনা করতে পারতাম, কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি রেখে যেটুকু উল্লেখ করেছি তার মধ্যেই আমি নিজেকে সীমিত রাখবো। নিশ্চিতভাবে আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি তাই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে।

একটি প্রশ্ন আপনাদের হৃদয়ে উত্থিত হতে পারে আর তাই আমি আগেই তার উত্তর দিয়ে দিই। আপনারা বলতে পারেন যে, যদি এগুলোই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিম বিশ্বে আমরা কেন এত বিভেদ ও বিশৃংখলা দেখে থাকি? এর উত্তর আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি একজন সংস্কারকের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, যাকে আমরা আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে বিশ্বাস করি। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সর্বদা যত দূর সম্ভব বিস্তৃত পরিসরে এ প্রকৃত শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছি। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা আপনাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলেও এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়াসী হবেন, যেন বিশ্বের সকল অংশে দীর্ঘ স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

যদি আমরা এ কাজে ব্যর্থ হই, তবে পৃথিবীর কোন অংশ যুদ্ধের ভয়াবহ সর্বনাশা প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকবে না। আমি দোয়া করি যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষকে, বিশ্বকে অনাগত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার প্রয়াসে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আকাঙ্খার উর্ধ্বে উঠার সৌভাগ্য দান করেন। আজকের বিশ্বে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলো সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী, আর তাই আজ অন্যান্যদের পূর্বে এটি আপনাদের দায়িত্ব যে, সংকটাপন্ন গুরুত্ববাহী এ বিষয়গুলোর প্রতি আপনাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন।

পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আরেকবার ধন্যবাদ দিতে চাই আমার বক্তব্য শুনতে সময় বের করে আসার জন্য। আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

মুসলমানদের পক্ষে কি পশ্চিমা সমাজে সমন্বিত হওয়া সম্ভব?

বায়তুর রশীদ মসজিদ
হামবুর্গ, জার্মানী, ২০১২
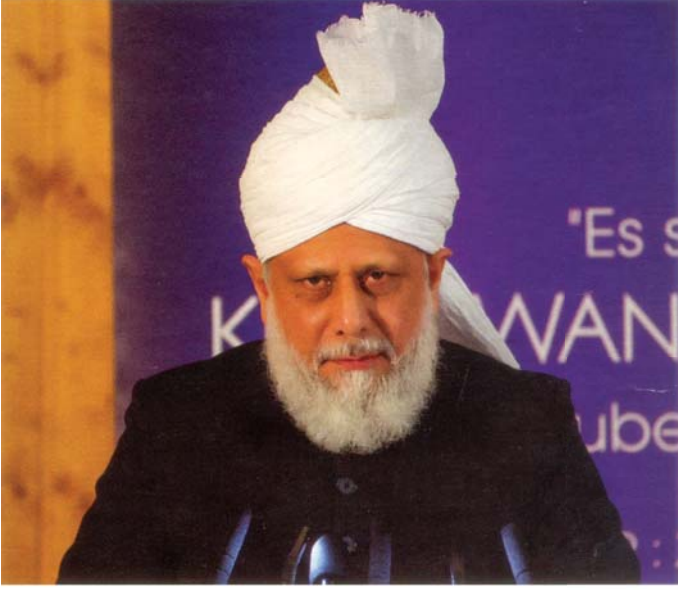
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ ৫ম (আই.)
বায়তুর রশীদ মসজিদে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিচ্ছেন।

মুসলমানদের পক্ষে কি পশ্চিমা সমাজে সমন্বিত হওয়া সম্ভব?

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম– আল্লাহর নামে যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

সকল সম্মানিত অতিথিবর্গ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু– আপনাদের সকলের উপর আল্লাহর শান্তি ও আশীষ বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি সেই সকল অতিথিবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই যারা আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের অনেকেই আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত বা আপনাদের সঙ্গে আহমদী মুসলমানদের পুরনো বন্ধুত্ব রয়েছে; আর আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের মধ্যে যারা সম্প্রতি আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তারা ইতোমধ্যেই এ জামা'ত সম্পর্কে আরো জানতে আপনাদের অন্তরে এক গভীর আগ্রহ অনুভব করছেন। আপনাদের সকলের অংশ গ্রহণ প্রমাণ করে যে, আপনাদের এ বিশ্বাস আছে যে, আহমদী মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাদের মসজিদগুলোতে যাওয়ার মধ্যে কোন বিপদ বা ঝুঁকি নেই।

সত্য এই যে, আজকের পরিমণ্ডলে, যেখানে ইসলাম সম্পর্কে প্রচারিত সংবাদ ও রিপোর্টসমূহের অধিকাংশই অত্যন্ত নেতিবাচক, আপনারা যারা অমুসলিম খুব সহজেই উদ্বিগ্ন হতে পারতেন যে, একটি আহমদী মসজিদে গেলে নানা সমস্যার উদ্ভব হতে পারে বা আপনার বড় কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু, যেভাবে আমি বলেছি, আপনারা যে আজ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন এটি প্রমাণ করে

যে, আহমদী মুসলমানদের আপনারা ভয় করেন না, আর তাদেরকে হুমকি হিসেবেও জ্ঞান করেন না। এটি প্রদর্শন করে যে, আপনারা আহমদীদের উত্তমরূপে মূল্যায়ন করেন এবং তাদেরকে আপনাদের তথা সংখ্যাগুরু জনগণের মতই আন্তরিক ও শিষ্টাচারী বলে বিশ্বাস রাখেন।

এরূপ বলার সময় আমি এ সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করছি না যে, আপনাদের মাঝে অল্প সংখ্যক এমন মানুষ থাকতে পারেন যারা, আজ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, এখনো মনে এমন সংকোচ বা উদ্বেগ লালন করেন যে, এখানে উপস্থিত হওয়ার কিছু নেতিবাচক পরিণতি থাকতে পারে। এটা সম্ভব যে আপনাদের মনে এ উৎকণ্ঠা রয়েছে যে, চরমপন্থী প্রবণতা বা মনোভাবের মানুষের পাশে হয়তো আপনাদের বসতে হবে। যদি আপনাদের কারো মনে এরূপ ভীতি থেকে থাকে, তবে আপনাদের অন্তর থেকে এ মুহূর্তে সেগুলো মুছে ফেলুন। আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক, আর তাই যদি ঘটনাক্রমে এমন কোন চরমপন্থী ব্যক্তি এ মসজিদে বা আমাদের এলাকায় প্রবেশের চেষ্টাও করে, তবে তাকে এ ভবন থেকে সরিয়ে নিতে দৃঢ় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করবো। সুতরাং আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, আপনারা নিরাপদ হাতে রয়েছেন।

বস্তুত: আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এমন একটি সম্প্রদায় যেখানে যদি কোন সদস্য কোন সময় কোথাও চরমপন্থী প্রবণতাসমূহ প্রকাশ করে থাকে, আইন ভঙ্গ করে বা শান্তি বিনষ্ঠ করে, তবে তাদেরকে জামা'ত থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরূপ দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করাকে আমরা আমাদের কর্তব্য মনে করি, কারণ 'ইসলাম' শব্দটির যার শাব্দিক অর্থ 'শান্তি' ও 'নিরাপত্তা' এর প্রতি আমরা পরম শ্রদ্ধাশীল। 'ইসলাম' শব্দের প্রকৃত চিত্র আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে প্রদর্শিত হয়। বস্তুত ইসলামের এই সঠিক চিত্র উপস্থাপনকারীর আবির্ভাবের মহান ভবিষ্যদ্বাণী আজ থেকে চৌদ্দ শতাধিক বছর পূর্বে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করে গিয়েছিলেন। সেই ভবিষ্যদ্বানীতে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, একটি সময় আসবে যখন মুসলমানদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইসলামের প্রকৃত বিশুদ্ধ শিক্ষা ভূলে যাবে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এমন সময়ে আল্লাহ এক ব্যক্তিকে সংস্কারকরূপে প্রেরণ করবেন এক মসীহ ও এক মাহদীরূপে যেন পৃথিবীর বুকে প্রকৃত ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

আমরা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বাস করি যে, আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) হলেন সেই ব্যক্তি যিনি এ মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহে এ সম্প্রদায় উন্নতি করেছে এবং আজ বিশ্বের ২০২টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব দেশগুলোর প্রত্যেকটিতে সকল পটভূমি ও জাতিসত্ত্বার স্থানীয় মানুষ আহমদীয়াতকে গ্রহণ করেছে। আহমদী মুসলমান হওয়ার পাশাপাশি তাদের নিজ নিজ দেশের বিশ্বস্ত নাগরিক হিসেবেও তারা নিজ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইসলামের প্রতি তাদের ভালবাসা ও দেশের প্রতি তাদের ভালবাসার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ দুই বিশ্বস্ততা একে অপরের সাথে অঙ্গা-অঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত। আহমদী মুসলমানগণ, তারা যেখানেই বসবাস করুন না কেন, পুরো জাতির মধ্যে তারাই আইনের প্রতি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক। নিশ্চিতভাবে, আমি সন্দেহের লেশমাত্র ছাড়াই বলতে পারি যে, আমাদের জামা'তের উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মাঝে এ গুণগুলো বিদ্যমান।

আর এ গুণগুলোর কারণেই যখনই কোন আহমদী মুসলমান এক দেশ থেকে আরেক দেশে অভিবাসন গ্রহণ করেন, অথবা যখন স্থানীয় মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেন, তখন আহমদীদের নতুন সমাজে একাত্ম হতে কখনো কোন সমস্যা হয় না; বা তারা এ নিয়ে বিচলিত বোধ করেন না যে, তাদের পরিগ্রহণকৃত দেশটির জাতীয় স্বার্থের বিস্তারে তারা কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারেন। আহমদীরা যেখানেই যাক, তারা যেভাবে সকল প্রকৃত নাগরিকের নিকট কাম্য সেভাবেই তাদের দেশকে ভালবাসবেন এবং তাদের দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রয়াসে সক্রিয়ভাবে তাদের জীবন অতিবাহিত করবেন। এটি ইসলাম যা আমাদেরকে এভাবে আমাদের জীবন যাপন করার শিক্ষা দেয়, আর বস্তুতঃ এটি কেবল একে মৃদুভাবে উৎসাহিত করে তা নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে আদেশ দেয় যেন আমরা আমাদের বসবাসের দেশের প্রতি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ত ও নিবেদিত থাকি। বস্তুতঃ মহানবী (সা.) এ বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন যে কোন প্রকৃত মুসলমানের জন্য তার দেশের প্রতি ভালবাসা তার ঈমান বা বিশ্বাসের অঙ্গ। যখন দেশপ্রেম ইসলামের একটি মৌলিক উপাদান, একজন প্রকৃত মুসলমান কিভাবে অবিশ্বস্ততা প্রদর্শন করতে পারে বা তার দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজ ঈমানকে বিসর্জন দিতে পারে? আহমদী মুসলমানদের প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে,

আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে জামা'তের আবালবৃদ্ধবণিতা দাঁড়িয়ে খোদাকে সাক্ষী রেখে শপথ করে থাকেন যে, কেবল নিজ ধর্মের জন্যই নয় বরং নিজ নিজ দেশ ও জাতির জন্য তাদের জীবন, সম্পদ, সময় ও মান-মর্যাদাকে কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকবে। সুতরাং তাদের চাইতে বেশি বিশ্বস্ত নাগরিক আর কে সাব্যস্ত হতে পারে, যাদেরকে সর্বক্ষণ তাদের দেশের সেবার কথা স্মরণ করানো হচ্ছে এবং যাদের কাছে তাদের ধর্ম, দেশ ও জাতির খাতিরে সকল প্রকার কুরবানীর জন্য সদা-প্রস্তুত থাকার শপথ বার বার নেয়া হয়ে থাকে।

কারো মনে প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, এখানে জার্মানীতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসেন পাকিস্তান, তুরস্ক ও অন্যান্য এশীয় দেশ থেকে, আর তাই যখন নিজ দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করার সময় আসে তখন তারা জার্মানীর বদলে তাদের পিতৃভূমিকে প্রাধান্য দিবে। অতএব আমার বিষয়টিস্পষ্ট ব্যাখ্যা করা উচিত যে যখন কোন ব্যক্তি জার্মান নাগরিকত্ব বা অন্য দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তখন তিনি সেই দেশের পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হয়ে যান। আমি এ বছর কোব্লেনয-এ অবস্থিত জার্মান সামরিক সদর দপ্তরে একটি বক্তৃতা প্রদানকালেও এ বিষয়টির দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আমি ব্যাখ্যা করেছি যে, ইসলামের শিক্ষা অনুসারে, কি হওয়া উচিত যদি এমন পরিস্থিতির উদয় হয় যে জার্মানীর সাথে এমন একটি দেশের যুদ্ধের সূত্রপাত হল যেটি জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণকারী একজন অভিবাসীর পিতৃভূমি। যদি সেই অভিবাসীর অন্তরে নিজ পিতৃভূমির প্রতি সমবেদনা সৃষ্টি হয় এবং তার মনে হয় যে, জার্মানীর কোন ক্ষতির আশঙ্কা করার বা তার দ্বারা কোন ক্ষতি সাধিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, তবে এরূপ ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ নিজ নাগরিকত্ব বা অভি বা সম মর্যাদা বিসর্জন করে নিজ পিতৃভূমিতে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু, যদি তিনি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তবে দেশটির প্রতি কোন প্রকারে বিশ্বাস ভঙ্গের কোন রূপ অনুমতি ইসলাম একেবারেই দেয় না। এটি একটি নিশ্চিত এবং দ্ব্যর্থহীন শিক্ষা। ইসলাম কোন প্রকারের বিদ্রোহাত্মক আচরণের, বা কোন নাগরিকের পক্ষে নিজ দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তের বা এর কোনরূপ ক্ষতি করার কোন অনুমতি দেয় না– তা অভিবাসনের মাধ্যমে অবলম্বনকৃত দেশ হোক বা অন্যরূপে। যদি কোন ব্যক্তি নিজ অবলম্বনকৃত দেশের বিরুদ্ধে কাজ করে বা এর কোন ক্ষতি করে তবে তাকে রাষ্ট্রের এক শত্রু, এক বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গণ্য করে দেশের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা উচিত।

এতে একজন মুসলমান অভিবাসীর ক্ষেত্রে অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। আর সেই ক্ষেত্রে, যেখানে একজন স্থানীয় জার্মান বা যে কোন দেশের কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, এটি তার জন্য একেবারে স্পষ্ট যে, তার নিজ মহান দেশের প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা ছাড়া তার জন্য অন্য কোন পথ থাকতে পারে না। আরেকটি প্রশ্ন মাঝে মধ্যেই উত্থাপিত হয়, আর তা এই যে, যখন পাশ্চাত্যের কোন দেশ কোন মুসলমান দেশের সাথে যুদ্ধে রত হয় তখন পাশ্চাত্যে বসবাসকারী মুসলমানদের করণীয় কি? এ প্রসঙ্গে আমার প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত যে, আমাদের জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, আমরা এখন এমন এক যুগে রয়েছি যেখানে ধর্মযুদ্ধ পুরোপুরি রহিত হয়েছে। ইতিহাসের পরিক্রমায় এমন সময় এসেছে যখন মুসলমান এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যুদ্ধ সমূহ সংঘটিত হয়েছে। সে সকল যুদ্ধে অমুসলিমদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের হত্যা করে ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

প্রাথমিক যুদ্ধগুলোর অধিকাংশের ক্ষেত্রে, অমুসলিমরা প্রথম আগ্রাসী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এর ফলে মুসলমানদের পক্ষে নিজেদেরকে এবং নিজ ধর্মকে রক্ষা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু, মসীহ মাওউদ (আ.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, সেরূপ পরিস্থিতির আর বিদ্যমান নয়। কেননা আধুনিক যুগের এমন কোন সরকার নেই যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা বা পরিকল্পনা করছে। বরং এর বিপরীতে আজ পাশ্চাত্য এবং অমুসলিম দেশগুলোর বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠে উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় স্বাধীনতা বিদ্যমান। আমাদের জামা'ত এরূপ স্বাধীনতাসমূহের জন্য অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, যা আহমদী মুসলমানদেরকে অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের বাণী প্রচারের অনুমতি দেয়। এর ফলে আমরা ইসলামের প্রকৃত ও সুন্দর শিক্ষাসমূহ, যেগুলো শান্তি ও সৌহার্দ্যের, পাশ্চাত্য জগতে উপস্থাপনের সুযোগ পাই। নিশ্চিতভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতার কারণে আজ আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য ইসলামের চিত্র উপস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছি। অতএব স্পষ্টতঃই আজ কোন ধর্মীয় যুদ্ধের প্রশ্ন নেই। এর বাইরে কেবল যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তা এই যে, যেখানে একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সাথে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের, বা অপর যে কোন দেশের ধর্মযুদ্ধ নয় এমন যুদ্ধের সূচনা হয়। তখন সেই খ্রিস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী দেশে বসবাসকারী মুসলমানের প্রতিক্রিয়া কি হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলাম একটি স্বর্ণালী নীতি প্রদান করেছে আর তা এই যে, কারো কখনো কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা বা

নির্যাতনে সহযোগিতা করা উচিত না। সুতরাং যদি নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচার মুসলমান দেশের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে সেটি বন্ধ করা উচিত। আর যদি কোন খ্রিস্টান দেশের পক্ষ থেকে নির্যাতন-নিপীড়ন পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে সেটিও বন্ধ করা উচিত।

একজন একক নাগরিক কিভাবে তার নিজ দেশকে অন্যায় অবিচার করা থেকে বিরত রাখতে পারে? এর উত্তর অত্যন্ত সহজ। আজ পাশ্চাত্য জগত জুড়ে গণতন্ত্র বিদ্যমান। যদি কোন বিবেকবান নাগরিকের দৃষ্টিতে তার সরকারের আচরণ নিপীড়ণমূলক হয়ে থাকে, তাহলে এর বিরুদ্ধে তার আওয়াজ উঠানো উচিত এবং নিজ দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করা উচিত। অথবা এমনকি এক দল মানুষও দণ্ডায়মান হয়ে এ বিষয়ে প্রয়াসী হতে পারে। যদি কোন নাগরিক দেখে যে তার দেশ অপর কোন দেশের সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ করছে, তখন তার নিজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজ উদ্বেগ প্রকাশ করা উচিত। দণ্ডায়মান হয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজ উদ্বেগসমূহ ব্যক্ত করা কোনরূপ বিদ্রোহ বা দেশদ্রোহিতার কাজ নয়। বরং এটি আপনার দেশের প্রতি প্রকৃতি ভালবাসারই এক অভিব্যক্তি। একজন ন্যায়বান নাগরিক নিজ দেশের সুনামকে কলঙ্কিত হতেবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে পদদলিত হতে দেখা সহ্য করতে পারেন না আর তাই এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার মাধ্যমে দেশের প্রতি তার ভালবাসা ও বিশ্বস্ততাই তিনি প্রকাশ করছেন।

যত দূর পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও এর প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক, ইসলাম শিক্ষা দেয় যে যেখানে কোন দেশের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমন করা হয়, তখন অন্যান্য দেশের একতাবদ্ধ হয়ে আগ্রাসীকে বিরত করার চেষ্টা নেয়া উচিত। যদি আগ্রাসী দেশের শুভ বুদ্ধির উদয় হয় এবং তারা পশ্চাদপসারণ করে তবে তাদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে বা পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে এর উপর নিষ্ঠুর শাস্তি আর অন্যায় সিদ্ধান্তসমূহ চাপিয়ে দেয়া উচিত না। সুতরাং সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতির জন্য ইসলাম সমাধান ও সুরাহার পথ প্রদান করে। ইসলামের শিক্ষার সারকথা হল আপনাকে অবশ্যই শান্তির বিস্তার করতে হবে, এমনকি মহানবী (সা.) একজন মুসলমানের সংজ্ঞা এই দিয়েছেন যে, সেই ব্যক্তির যার হাত ও জিহক্ষা (কাজ ও কথা) থেকে অপর সকল শান্তিপূর্ণ মানুষ নিরাপদ। যেভাবে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, কখনো নিষ্ঠুরতা বা অত্যাচারে সহযোগিতা করবে না। এটি এই সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা যা একজন প্রকৃত মুসলমানকে, তিনি যে দেশেই বাস করুন না কেন এক সম্মান

ও মর্যাদার অবস্থান দান করে। এতে কোন সন্দেহ নাই যে সকল আন্তরিক ও ভদ্র মানুষ তাদের সমাজে এমন শান্তিপূর্ণ ও সুবিবেচক মানুষের প্রত্যাশা করবে।

মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের জীবন যাপনের জন্য আরেকটি সুন্দর শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি শিখিয়েছেন যে, সবসময় যা কিছু উত্তম এবং পবিত্র একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর সেটির অনুসন্ধানে থাকা উচিত। তিনি শিখিয়েছেন যে যখনই কোন মুসলমান কোন জ্ঞানের কথা বা মহৎ কিছুর সন্ধান পান, তার উচিত সেটিকে নিজ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ন্যায় গণ্য করা। অর্থাৎ যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে মানুষ নিজ ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার অর্জনের জন্য চেষ্টা করে, মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, বিজ্ঞ পরামর্শ এবং উত্তম যা কিছু আছে তা যেখানেই পাওয়া যাকনা কেন তা গ্রহণ করে তা থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য যেন তারা চেষ্টা করে। এমন এক সময়ে যখন সমাজে অভিবাসীদের একাত্ম হওয়ার বিষয়ে এত বেশি উদ্বেগ ও টানাপোড়েন, তার জন্য এটি কতই না সুন্দর ও পরিপূর্ণ পথ প্রদর্শনকারী নীতি। মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় হয়েছে যে নিজ স্থানীয় সমাজে একাত্ম হওয়া এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার জন্য তাদের উচিত প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক অঞ্চল, প্রত্যেক শহর আর প্রত্যেক দেশের ভাল দিকগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। এসব মূল্যবোধ সম্পর্কে কেবল জানাটাই যথেষ্ট না, বরং মুসলমানদের নিজ ব্যক্তিগত জীবনে এগুলো অবলম্বন করার জন্য জোর প্রয়াস গ্রহণ করা উচিত। এটি এমন এক দিক নির্দেশনা যা প্রকৃতপক্ষে একত্ববোধ এবং পারস্পরিক আস্থা ও ভালবাসার চেতনাকে গড়ে তোলে। বস্তুতঃ তার চেয়ে অধিক শান্তিকামী আর কে হতে পারে, যে একজন প্রকৃত বিশ্বাসী হয়ে, নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সকল দায়িত্ব পূরণের পাশাপাশি, নিজের বা অন্য যেকোন সমাজের সকল উত্তম বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের চেষ্টা করে? তার চেয়ে বেশি শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তারকারী কে হতে পারে?

আজ যোগাযোগ মাধ্যমে সহজপ্রাপ্য তার কারণে পুরো পৃথিবীকে এক বিশ্বপল্লী হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি এমন এক বিষয় যার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে মহানবী (সা.) করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে এক সময় আসতে যখন পুরো পৃথিবীকে একত্রিত করা হবে আর দূরত্বসমূহ সংকুচিত হয়েছে বলে মনে হবে। বস্তুতঃ এটি পবিত্র কুর'আনের একটি ভবিষদ্বাণী, যার তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) শিখিয়েছেন যে, যখন এমন সময় আসবে, মানুষের উচিত হবে একে অপরের ভাল দিকগুলো জানার চেষ্টা করা এবং সেগুলোকে সাদরে গ্রহণ করা, ঠিক সেভাবে যেভাবে

মানুষ তার হারানো সম্পদ খোঁজার চেষ্টা করে। অন্য কথায় বলা যেতে পারে যে, সকল ইতিবাচক বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে এবং সকল নেতিবাচক বিষয়কে বর্জন করতে হবে। পবিত্র কুর'আন এ আদেশটিকে ব্যাখ্যা করে এ কথার মাধ্যমে যে, প্রকৃত মুসলমান সেই যে ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। এ সব কিছুকে মাথায় রেখে কোন দেশ বা সমাজ কি এ কথা বলতে পারে যে, তাদের মাঝে এমন শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের বা ইসলামের অবস্থানকে তারা গ্রহণ বা সহ্য করতে পারে না? গত বছর আমার সুযোগ হয়েছিল বার্লিনের মেয়রের সাথে কথা বলার এবং আমি তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, যে কোন জাতির প্রত্যেকটি ভাল গুণকে এমনভাবে নেয়া উচিত যেন তা নিজস্ব সম্পত্তি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, যদি আপনারা এ শিক্ষার উপর আমল করেন, তবে কোন সন্দেহ নাই যে পুরো বিশ্ব আপনাদের সাথে হাত মিলাবে এবং আপনাদেরকে সমর্থন করবে।

আমি অত্যন্ত হতভম্ব ও দুঃখিত হই যখন শুনি যে, জার্মানীর কোন অংশে এমন মানুষ রয়েছেন যারা দাবি করেন যে, না মুসলমানগণের আর না ইসলামের সাধ্য রয়েছে যে জার্মান সমাজের সাথে একাত্ম হয়। নিশ্চয় এটা সত্য যে, চরমপন্থী প্রদর্শিত ইসলামের চিত্র জার্মানী কেন, কোন দেশ বা সমাজেই গ্রহণযোগ্য হতে পারবে না। বরং একটি সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন এমন চরমপন্থী মতাদর্শের বিরুদ্ধে এমনকি মুসলমান দেশসমূহের উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ উত্থিত হবে। এতদসত্ত্বেও মহানবী (সা.) এর আনীত প্রকৃত ইসলাম সবসময় আন্তরিক ও শালীনতাবোধসম্পন্ন মানুষদের আকৃষ্ট করতে থাকবে। এ যুগে মহানবী (সা.) এর দাসরূপে আল্লাহতা'লা মসীহ মাওউদ (আ.)কে পাঠিয়েছেন ইসলামের সেই আদি শিক্ষাসমূহের পুনরুজ্জীবনের জন্য আর তাই তাঁর সম্প্রদায় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল এবং সেই বাণী প্রচার করে থাকে।

এটা স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক কেউ যুক্তিসঙ্গতভাবে এ দাবি করতে পারবে না যে প্রকৃত ইসলাম কোন সমাজের সাথে একাত্ম হতে পারে না। প্রকৃত ইসলাম সেটি যা পূণ্যকর্ম ও সদ্‌গুণাবলীর বিস্তার ঘটায় এবং সকল প্রকারের পাপ ও অপকর্মকে বর্জন করে। প্রকৃত ইসলাম মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয় যে, পাপকাজ ও নিষ্ঠুরতা যেখানেই থাকুক না কেন তা বন্ধ করতে। তাই এর একাত্ম হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার তো কোন প্রশ্নই উঠে না, বরং প্রকৃত ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই একটি চুম্বকের ন্যায় সমাজকে এর দিকে আকৃষ্ট করে। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কোন ব্যক্তির কেবল নিজের জন্য শান্তি কামনা বা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত নয়, বরং

নিজেদের ন্যায় সেই একই আবেগের সাথে অপরাপর মানুষের মাঝে শান্তি ও সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। এরূপ নিঃস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গীই বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ। এমন কি কোন সমাজ রয়েছে যা এরূপ শিক্ষার সমাদর করবে না এবং এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুমোদন করবে না? নিশ্চিতভাবে একটি ভাল সমাজ কখনো তার মাঝে অনৈতিকতা ও পাপকর্মের বিস্তারের আকাঙ্ক্ষী হতে পারে না, আর কখনো সদ্‌গুনাবলী ও শান্তির বিস্তারের বিরোধিতাও করবে না।

যখন আমরা 'সদগুণ' এর সংজ্ঞা দিতে যাব, তখন এমন হতে পারে যে একজন ধর্ম পালনকারী ব্যক্তি এবং একজন অধার্মিক ব্যক্তি একে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন। ইসলাম 'ভালত্ব' এবং 'সদ্‌গুণ' এর যে সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করে তার মধ্যে দু'টি বিষয় সার্বজনীন গুরুত্ব রাখে এবং এগুলো থেকেই অপর সকল সদ্‌গুণ উৎসারিত। একটি হল সর্বশক্তিমান আল্লাহর অধিকার এবং অপরটি হল মানবজাতির অধিকার। এর একটির বিষয়ে একজন ধার্মিক এবং একজন অধার্মিক ব্যক্তির মানবজাতির অধিকার বা মানবজাতির প্রতি দায়িত্বের বিষয় কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব উপাসনার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং সকল ধর্ম তাদের অনুসারীদেরকে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। মানুষের অধিকারের বিষয়টি এমন যে ধর্মসমূহ ও সমাজ এ বিষয়ে মানবজাতিকে শিক্ষা দান করেছে। ইসলাম আমাদেরকে মানুষের অধিকারের বিষয়টি সুগভীর ও বিস্তারিতভাবে শিক্ষা দিয়েছে আর তাই এ সময়ে এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা অসম্ভব সাব্যস্ত হবে। কিন্তু আমি ইসলাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের উল্লেখ করবো। যেগুলো সমাজে শান্তির প্রসারের জন্য আবশ্যক।

ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, অন্যের আবেগ অনুভূতিকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে এবং এ বিষয়ে যত্নবান থাকতে হবে। এর মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও সাধারণভাবে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে অন্যের অনুভূতি অন্তর্ভূক্ত। একবার, এক ইহুদি ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতির সংরক্ষণের খাতিরে মহানবী (সা.) সেই ইহুদীর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন যখন তিনি তাঁর (সা.) কাছে তার এবং এক মুসলমানের মধ্যে যে বিতর্ক হয়েছিল সে বিষয়ে অভিযোগ করেন। সেই ইহুদী ব্যক্তির অনুভূতি বিবেচনা করে, মহানবী (সা.) সেই মুসলমানকেই শাসন করেছিলেন এ কথা বলে যে, তার উচিত না মূসা (আ.) এর উপর মহানবী (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা; যদিও তিনি জানতেন যে তাঁর (সা.) নিকটই সর্বশেষ ধর্ম-বিধান আবির্ভূত হয়েছিল। এটিই হল সেই দৃষ্টিভঙ্গী যার সাথে মহানবী (সা.) অন্যের অনুভূতির প্রতি যত্নবান থাকতেন এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতেন।

ইসলামের আরেকটি মহান শিক্ষা দাবি করে যে, গরীব এবং বঞ্চিতদের অধিকার যেন পূর্ণ হয়। এতদুদ্দেশ্যে এটি শিক্ষা দেয় যে, মানুষের এমন সুযোগসমূহ অনুসন্ধান করা উচিত যার মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানের উন্নতি হয়। আমাদের উচিত বঞ্চিতদের প্রতি নিঃস্বার্থভাব সহায়তার চেষ্টা করা এবং কখনো কোনভাবে তাদের দুরবস্থার সুযোগ নেয়া উচিত না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আজকের সমাজে আপাতঃ দৃষ্টিতে বঞ্চিতদের 'সাহায্য' করার উদ্দেশ্যে যখন বিভিন্ন প্রকল্প বা সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা হয়, সেগুলো প্রায়শঃই এমন ঋণ-পদ্ধতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় যেখানে সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায়ই তাদের পড়াশুনা সম্পন্ন করতে সহায়তা করার জন্য ঋণ দেয়া হয় বা মানুষ কোন ব্যবসা শুরু করার জন্য ঋণ গ্রহণ করে, আর এটা পরিশোধ করতে তাদের কয়েক বছর এমনকি কয়েক দশক লেগে যায়। যদি কয়েক বছর কঠোর সংগ্রামের পর এক অর্থনৈতিক মন্দা এসে আঘাত করে তবে তাদের ঋণের মাত্রা আবার বেড়ে (ঋণ পরিশোধ) শুরু করার সময় যা ছিল তার অনুরূপ হয়ে যেতে পারে, এমনকি তার চেয়েও গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হতে পারে। আমরা গত কয়েক বছরে যখন বিশ্বের বহুলাংশ অর্থনৈতিক সংকটে আক্রান্ত হয় তখন এমন অগণিত উদাহরণ দেখেছি বা শুনেছি।

একটি অভিযোগ যা প্রায়শই ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় তা এই যে, এতে মহিলাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত ও সমতাপূর্ণ আচরণ করা হয় না। কিন্তু, এ অভিযোগটির কোন ভিত্তি নেই। ইসলাম মহিলাদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান সুনিশ্চিত করেছে। আমি দুএকটি উদাহরণ দিচ্ছি। স্বামীর অসদাচরণের কারণে মহিলাদেরকে সেই যুগে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে যে সময় মহিলাদেরকে কেবল নিজ ব্যক্তিগত সম্পতি বা ঘরের আসবাব পত্রের ন্যায় গণ্য করা হত। এটিতো কেবল গত শতাব্দীর কথা যে, উন্নত বিশ্বে মহিলাদের জন্য যথাযথ ভাবে এ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্ত, ইসলাম সেই যুগে মহিলাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেছে যখন তাদের কোন মান মর্যাদা ছিল না। এ অধিকারও ইউরোপের মহিলাদেরকে তুলনামূলক সাম্প্রতিক কালেই প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম প্রতিবেশীদেরকেও এক অধিকার প্রধান করে।

আপনার প্রতিবেশী এবং তাদের অধিকার কি এ বিষয়ে কুর'আন বিস্তারিত দিক নির্দেশনা প্রদান করে। প্রতিবেশীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত তারা যারা আপনার পাশে বসেন, যাদের বাড়ি আপনার নিকটে, এর মধ্যে তারাও পড়েন যারা আপনার

পরিচিত, আর তারাও যারা আপনার অপরিচিত বরং প্রকৃতপক্ষে, আপনার চতুর্দিকে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত আপনার প্রতিবেশীর মধ্যে গণ্য। প্রতিবেশীদের মধ্যে তারাও গণ্য যারা আপনার সাথে ভ্রমণ করেন, আর তাই আমাদেরকে তাদের বিষয়ে যত্নবান হতে বলা হয়েছে। এ অধিকারের উপর এত জোর দেয়া হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন যে, তার মনে হল হয়তো প্রতিবেশীদের নির্ধারিত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। বস্তত: মহানবী (সা.) এত দূর পর্যন্ত বলেছেন যে, এমন ব্যক্তি যার প্রতিবেশী তার থেকে নিরাপদ নয় তাকে বিশ্বাসী বা মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যায় না।

অন্যের কল্যাণের জন্য ইসলামের আরেকটি আদেশ এ দাবি করে যে, দুর্বল এবং অসহায় যেন উঠে দাঁড়াতে পারে এবং নিজেদের অবস্থানকে উন্নত করতে পারে তার সহায়তাকল্পে সকল পক্ষ একে অপরকে সাহায্য ও সমর্থন করবে। তাই, এ শিক্ষার বাস্তবায়ন কল্পে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বের দরিদ্র ও বঞ্চিত অংশে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা সেবা প্রদান করছে। আমরা বিদ্যালয় সমূহ নির্মাণ ও পরিচালনা করছি, বৃত্তি প্রদান করছি যেন তারা, যারা বঞ্চিত, এমন এক অবস্থানে পৌঁছতে পারে যেখানে তার নিজ দুই পায়ের উপর দণ্ডায়মান হতে পারে।

ইসলামের আরেকটি আদেশ এই যে, আপনাকে আপনার সকল প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে। এর মধ্যে একে অপরকে দেয়া প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত আর এটি এ দাবিও করে যে একজন মুসলমানকে তার দেশের নাগরিক হিসেবে বিশ্বস্ততার যে শপথ তিনি গ্রহণ করেন তা অবশ্যই পূরণ করতে হবে। এটি এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।

এগুলো কেবল কয়েকটি বিষয় যার উল্লেখ আমি করলাম এটি প্রদর্শন করার জন্য যে ইসলাম কত দূর পর্যন্ত সহানুভূতিপূর্ণ ও প্রেমময় একটি ধর্ম। এটি গভীর দুঃখের বিষয় যে, যে দৃঢ়তার সাথে ইসলাম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা ও উপদেশ দেয়, সমান দৃঢ়তার সাথে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা বা তারা যারাএর প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অঙ্গ, এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন আপত্তি উত্থাপন করে যাচ্ছে। যেভাবে আমি বলেছি, এই যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইসলামের প্রকৃত বানীর প্রচার ও প্রদর্শনকরে যাচ্ছে। এর আলোকে আমি তাদেরকে অনুরোধ করবো যারা সংখ্যালঘু কিছু মুসলমানের আচরণের ভিত্তিতে ইসলামের উপর আপত্তি উত্থাপন করে যে, ঐ সকলকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবশ্যই প্রশ্ন করুন এবং তাদের দায়ী করুন, কিন্তু,এরূপ অন্যায় উদাহরণ ব্যবহার করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে অপমান ও অবমূল্যায়ন তাদের করা উচিত নয়।

ইসলামের শিক্ষাকে জার্মানী বা বিশ্বের অন্য দেশের জন্যক ঝুঁকিপূর্ণ বা হুমকি স্বরূপ বলে আপনাদের গণ্য করা উচিত নয়। এ নিয়ে আপনাদের উদ্বিগ্নও হওয়া উচিত নয় যে, একজন মুসলমান জার্মান সমাজে একাত্ম হতে পারবে কি না। যেভাবে আমি ইতোমধ্যে বলেছি, ইসলামের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল এটি মুসলমানদের সকল ভাল বিষয়কে গ্রহণ করার শিক্ষা দেয় আর তাই এতে কোন সন্দেহ নাই যে মুসলমানেরা যে কোন সমাজে বসবাস করতে পারে। যদি কেউ এর বিপরীত কিছু করে তবে সে নামে মুসলমান, কিন্তু ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুসারী নয়। নিশ্চয়, যদি কোন মুসলমানকে এমন কিছু করতে বলা হয় যা সঠিক নয় বা শালীনতা বা ধর্মের পবিত্রতা সংক্রান্ত পবিত্র কুর'আনে বর্ণিত আদেশাবলী উপেক্ষা করতে বলা হয় বা পূন্যকর্মের বিপরীত আচরণ করতে বলা হয়, তবে তারা তা করতে পারেন না। তবে, এ বিষয়গুলো সমাজে একান্ত তার বিষয় নয় বরং প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ধর্মীয় স্বাধীনতার লঙ্ঘন এমন একটি প্রশ্ন নয় যার বিরুদ্ধে মুসলমানগণ একাই দণ্ডায়মান হবেন, সকল আন্তরিকতাপূর্ণ ও শিষ্টাচারী ব্যক্তির খোলাখুলি ঘোষণা করা উচিত যে কোন সরকার বা সমাজের কারো ব্যক্তিগত ধর্মীয় অধিকারের শধ্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এটি আমার দোয়া যে জার্মানী, আর প্রত্যেক এমন দেশ যা বিভিন্ন জাতিমত্তা ও সংস্কৃতির মানুষের আবাসস্থলে পরিনত হয়েছে, যেমন একে অপরের আবেগ-অনুভুতির প্রতি সবোচ্চ মানের সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করতে পারে। এভাবে,তারা যেন পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রদর্শনকারীদের পতাকাবাহীতে পরিণত হয়। এটি বিশ্বের স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের কারণ হবে, যার ফলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার চরম অনুপস্থিতিতে যে ধ্বংসের দিকে বিশ্ব ধেয়ে চলেছে তা থেকে একে রক্ষা করা যাবে।

ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের হুমকি আমাদের উপর ছেয়ে রয়েছে,আর তাই এরূপ বিপর্যয় থেকে আমাদেরকে রক্ষার জন্য, প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক, ব্যক্তির ধার্মিক হোক বা না হোক, অত্যন্ত গভীর সতর্কতার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি এ বাস্তবতাকে অনুধাবন করুন।

পরিশেষে আমি আপনাদের সবাইকে আজ উপস্থিত হয়ে আমার বক্তব্য শোনার সময় ব্যয় করার জন্য আরেক বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই। আল্লাহ্ আপনাদের সকলকে আশীষ মণ্ডিত করুন। আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট পত্র

হিজ হোলিনেস পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট-এর নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্‌স, লন্ডন
SW18 5QL, UK

৩১ অক্টোবর ২০১১

হিজ হোলিনেস পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট,

আমার দোয়া এই যে আল্লাহ্‌তা'লা আপনার উপর তাঁর অনুগ্রহ ও কল্যাণ বর্ষণ করুন।

নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে আমি হিজ হোলিনেস পোপের নিকট পবিত্র কুর'আনের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি:

"তুমি বল, 'হে আহ্‌লে কিতাব! তোমরা এমন এক কথায় (একমত) হও, যা আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে অভিন্ন (আর তা হলো এই), আমরা যেন আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো ইবাদত না করি এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক না করি। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা নিজেরা একে অন্যকে যেন প্রভু-প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি।"... [৩:৬৫]

ইসলাম আজকাল বিশ্বের শ্যেনদৃষ্টির নিচে আছে, আর প্রায়শঃই একে ঘৃণ্য অভিযোগের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হচ্ছে। অবশ্য, যারা এসব অভিযোগ করে থাকেন, তারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে কোন অনুসন্ধান না করেই এরূপ করে থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে কতিপয় মুসলিম সংগঠন, কেবল নিজ

স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইসলামকে সম্পূর্ণ ভূল আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছে। এর ফলে পশ্চিমা ও অমুসলিম দেশসমূহের মানুষের হৃদয়ে মুসলমানদের প্রতি অনাস্থা বৃদ্ধি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে।

প্রত্যেক ধর্মের উদ্দেশ্য হল মানুষকে খোদাতা'লার নিকট নিয়ে যাওয়া এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। কোনদিন কোন ধর্মের প্রবর্তক তাঁর অনুসারীদেরকে অন্যের অধিকার হরণ বা নিষ্ঠুর আচরণের শিক্ষা দেন নি। তাই গুটি কতক বিপথগামী মুসলমানের আচরণকে ইসলাম বা এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.)-এর উপর আক্রমণের বাহানা বানানো উচিত নয়। ইসলাম আমাদেরকে সকল ধর্মের নবীগণকে সম্মান করার শিক্ষা দেয়, আর এ জন্য পবিত্র বাইবেল বা পবিত্র কুর'আনে উল্লিখিত সকল নবীর উপর বিশ্বাস রাখা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আর এর মধ্যে যিশুখ্রিস্ট (আ.) পর্যন্ত সকল নবীই অন্তর্ভুক্ত। আমরা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নগণ্য দাস, আর তাই তাঁর উপর আক্রমণসমূহে গভীরভাবে মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হই; কিন্তু, আমরা বিশ্বের সামনে তাঁর অনুপম গুণাবলি ও পবিত্র কুর'আনের সুন্দর শিক্ষা আরো ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমেই এর উত্তর দিয়ে থাকি।

যদি কেউ কোন শিক্ষা অনুসরণের দাবি করে অথচ সঠিকভাবে সেই শিক্ষার অনুসরণ না করে তবে সেই ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী, সেই শিক্ষা নয়। ইসলাম শব্দের অর্থই শান্তি, সৌহার্দ্য, নিরাপত্তা। 'ধর্মের বিষয়ে কোন বল প্রয়োগ নেই' - এটি পবিত্র কুর'আনের স্পষ্ট আদেশ। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পবিত্র কুর'আন ভালোবাসা, সহমর্মিতা, শান্তি, বিবাদ মিটিয়ে ফেলা ও ত্যাগের স্পৃহার শিক্ষা দিয়েছে। পবিত্র কুর'আন বারবার বলে যে, যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণতা অবলম্বন করে না সে আল্লাহতা'লা থেকে বহু দূরে। অতএব, যদি কেউ ইসলামকে রক্তপাতের শিক্ষায় পূর্ণ এক চরমপন্থি ও সহিংস ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করে, তবে এরূপ চিত্রের সাথে প্রকৃত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় কেবলমাত্র প্রকৃত ইসলামের অনুশীলন করে থাকে এবং কেবলমাত্র সর্বশক্তিমান খোদার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। যদি কোন গির্জা বা অন্য কোন উপাসনালয়ে নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তারা আমাদেরকে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো দেখতে পাবে। যদি কোন বাণী আমাদের মসজিদ থেকে ধ্বনিত হয়, তবে তা কেবল হবে যে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ।

একটি বিষয় যা বিশ্বের শান্তি নষ্ট করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে তা হল, কিছু মানুষ মনে করেন যে যেহেতু তারা বুদ্ধিমান, উচ্চ-শিক্ষিত ও (তথাকথিত) মুক্ত সমাজের অংশ, সেহেতু ধর্ম প্রবর্তকদের তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে। সমাজে শান্তি বজায় রাখার জন্য আবশ্যক যে, একের হৃদয়ে অন্যের প্রতি সকল প্রকার বৈরিতার অনুভূতি দূর করা আর আমাদের সহনশীলতার মাত্রাও বৃদ্ধি করা। এ প্রয়োজন রয়েছে যে, আমরা, একে অপরের নবীর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান রক্ষার্থে দণ্ডায়মান হই। বিশ্ববাসী আজ অস্থিরতা ও অস্বস্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছে, আর এর ফলে আমাদের উপর দায়িত্ব বর্তায় যে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে আমরা এ উৎকণ্ঠা ও ভীতিকে দূর করি; আর আমাদের আশেপাশের মানুষের কাছে যেন আমরা ভালোবাসা ও শান্তির বার্তা পেশ করি যেন আমরা পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি সম্প্রীতির সাথে এবং ভালোভাবে জীবন যাপন করতে শিখি যাতে আমরা মানবীয় মূল্যবোধসমূহকে যথাযথভাবে চিনতে পারি।

আজ পৃথিবীতে ছোট পর্যায়ের যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হচ্ছে আর অন্য দিকে পরাশক্তিগুলো দাবি করছে যে তারা শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। এটা আর গোপন বিষয় নয় যে, উপরে আমাদেরকে এক কথা বলা হয়, কিন্তু পর্দার আড়ালে প্রকৃতপক্ষে তাদেরই উদ্দেশ্য ও নীতির বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলতে থাকে। এ অবস্থায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব কিনা সেটাই প্রশ্ন। পরিতাপের বিষয়, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই

রচিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি এমন পথাবলম্বন করা হত যা সমতার মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচারের দিকে আমাদের নিয়ে যেত, তবে আমাদেরকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে হত না, যেখানে এটি পুনরায় অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে। এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকায় পৃথিবীতে পারস্পরিক আক্রোশ ও শত্রুতা বেড়েই চলেছে আর আজ পৃথিবী ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজ যদি এসব গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র বিস্ফোরিত হয়, পরবর্তী অনেকগুলো প্রজন্ম তাদের উপর স্থায়ী প্রতিবন্ধিতা বা পঙ্গুত্ব আরোপের জন্য আমাদেরকে কোন দিন ক্ষমা করবে না। এখনো সময় আছে যে, বিশ্ববাসী তাদের স্রষ্টা ও তাঁর অপরাপর সৃষ্টির অধিকারের প্রতি মনোযোগী হতে শুরু করে।

আমার বিশ্বাস যে, এখন বিশ্বের অগ্রগতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে, এটা প্রয়োজন বরং অত্যাবশ্যকীয় যে আমরা জরুরী ভিত্তিতে বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে আমাদের প্রচেষ্টায় গতি সঞ্চার করি। মানবজাতির জন্য তার স্রষ্টাকে চেনা আবশ্যক কেননা মানবতাকে টিকিয়ে রাখার এটিই একমাত্র নিশ্চয়তা দানকারী, নতুবা এ পৃথিবী দ্রুত আত্মাহুতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আজ যদি কেউ প্রকৃতই শান্তি স্থাপনে সফলকাম হতে চায়, তবে তার জন্য অন্যের দোষ খোঁজার চেয়ে নিজের ভেতরের শয়তানকে নিয়ন্ত্রণ করা অধিকতর প্রয়োজন। নিজ পাপ বা সীমালঙ্ঘনসমূহ দূর করে সেই ব্যক্তির উচিত ন্যায়ের এক অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করা। আমি বারবার বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে থাকি যে, অন্যের প্রতি এ অতিরিক্ত বৈরিতা মানবীয় মূল্যবোধসমূহকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করছে, যার ফলে বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন করার পথে নিয়ে যাচ্ছে।

যেহেতু বিশ্বে আপনার এক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর রয়েছে, আমি আপনাকেও আরো বিস্তৃত পরিসরে বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য তাগিদ করছি যে, খোদাতা'লার প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক যে ভারসাম্য, তার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে তারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ বাণী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বিস্তৃত পরিসরে এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে দুর-দূরান্তে পৌঁছানো আবশ্যক।

বিশ্বের সকল ধর্মের জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজন আর বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। আমার প্রার্থনা এই যে, আমরা সকলে যেন নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এবং এ জগতে আমাদের স্রষ্টাকে চেনানোর প্রক্রিয়ায় নিজ ভূমিকা পালন করতে পারি। আমাদের নিজেদের হাতে দোয়ার অস্ত্র আছে, আর আমরা সর্বদা আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি যে পৃথিবীর ধ্বংস যেন এড়ানো যায়। আমি দোয়া করি, যে ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের জন্য অপেক্ষমান তা থেকে আমরা যেন রক্ষা পাই।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL, UK

হিজ এক্সিলেন্সী মিস্টার বেনজামিন নেতানিয়াহু
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী
জেরুযালেম

২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

আমি সম্প্রতি ইসরায়েলের রাষ্ট্রপতি হিজ এক্সিলেন্সী শিমন পেরেয-এর কাছে বিশ্বের উদীয়মান ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম। যে দ্রুততার সাথে পট পরিবর্তন হয়ে চলেছে তাতে আমি অনুভব করেছি আপনার কাছেও আমার বার্তা পৌঁছানো প্রয়োজন, যেহেতু আপনার দেশের সরকার প্রধান আপনিই।

আপনার জাতির ইতিহাসের সাথে নবুয়ত ও ঐশীবাণীর নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। নিশ্চিতভাবে বনী ইসরায়েলী নবীগণ আপনার জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। নবীগণের শিক্ষার প্রতি অবাধ্যতা এবং তাদের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের প্রতি ঔদাসীন্যতার ফলস্বরূপ বনী ইসরায়েলী জাতিকে বহু কষ্ট ও পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে। যদি আপনার জাতির নেতৃবর্গ নবীগণের আনুগত্যে অবিচল থাকতেন তবে বহুবিধ দুর্ভাগ্যজনক ও প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অতএব এটা আপনাদের দায়িত্ব বরং অন্য সবার চেয়ে বেশি যে, আপনারা নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ ও আদেশাবলির প্রতি দৃষ্টি দিবেন।

আমি আজ সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.) এর খলীফা হিসেবে আপনাদের সম্বোধন করছি, যাঁকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সেবকরূপে পাঠানো হয়েছিল; আর মহানবী (সা.)-কে মূসা (আ.) এর সাদৃশ্যে বনী ইসরায়েলীদের ভ্রাতৃকূলে [দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮] সমগ্র

মানবজাতির প্রতি রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। তাই খোদার বাণী আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। আমার প্রত্যাশা এই যে, আপনারা তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবেন যারা খোদার ডাকে সাড়া দেয়, এবং যারা সঠিক পথ লাভে সফলকাম হয়; সেই পথ যা আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিপতি, সুমহান খোদার হেদায়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

আমরা আজকাল সংবাদে এরূপ খবর শুনে থাকি যে, আপনারা ইরানের উপর আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। অথচ কোন বিশ্বযুদ্ধের পরিণতির ভয়াবহতার আপনারা চাক্ষুষ সাক্ষী। বিগত বিশ্বযুদ্ধে বহু মিলিয়ন সংখ্যায় যেমন অন্যান্য মানুষ নিহত হয়েছে, তেমনি লক্ষ লক্ষ ইহুদিরও প্রাণহানি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার জাতির মানুষদের জীবন রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এ দিকে ইশারা করছে যে, কোন বিশ্বযুদ্ধ কেবল দু'টি দেশের মধ্যে সংঘটিত হবে না, বরং জোটসমূহ গঠিত হবে। একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনার যে আশংকা বিরাজমান তা অত্যন্ত গুরুতর। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদি সকলের জীবনই এতে বিপন্ন। যদি এমন যুদ্ধের সূচনা হয়ে যায় তবে তা মানবতা ধ্বংসের এক পর্যায়ক্রমিক ধারায় রূপ নেবে। ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহ এ দুর্যোগের ফল ভোগ করবে। এটা এ কারণে যে, এরূপ কোন যুদ্ধে নিঃসন্দেহে পারমাণবিক সমরাস্ত্র ব্যবহৃত হবে।

অতএব, আপনার কাছে আমার আবেদন এই, বিশ্বকে একটি বিশ্বযুদ্ধের করাল-গ্রাসের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব না দিয়ে, পৃথিবীকে একটি বিশ্বজনীন ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষার জন্য আপনারা সর্বোচ্চ প্রয়াস গ্রহণ করবেন। বিরোধসমূহকে বলপ্রয়োগে নিরসন না করে, আপনাদের প্রয়াস হওয়া উচিত যেন সংলাপের মাধ্যমে এগুলোর সুরাহা হয়, যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহকে প্রতিবন্ধিতা ও জন্মগত ত্রুটিসমূহ 'উপহার' দেয়ার পরিবর্তে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারি।

আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে আপনাদের শিক্ষা থেকে নেয়া নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করবো; যার প্রথমটি যবূর থেকে নেয়া:

"তুমি দুরাচারদের বিষয়ে রুষ্ট হয়ো না; অধর্মচারীদের প্রতি ঈর্ষা করো না। কেননা তারা ঘাসের ন্যায় শীঘ্র ছিন্ন হবে, হরিৎ তৃণের ন্যায় ম্লান হবে। সদাপ্রভুতে বিশ্বাস রাখ, এবং সদাচারণ কর, নিজভূমে বাস কর, এবং নিরাপদ পশুচারণক্ষেত্রে চর। আর সদাপ্রভুতে আনন্দে মেতে থাক, তিনিই তোমার মনোবাসনাসমূহ পূর্ণ করবেন। তোমার জীবন পথের ভার সদাপ্রভুতে অর্পণ কর। তাঁর ওপর নির্ভর কর, তিনিই

কর্ম সাধন করবেন। তিনি দীপ্তির ন্যায় তোমার ন্যায়পরায়ণতাকে স্পষ্ট করবেন, এবং তোমার বিচারকে মধ্যাহ্নের ন্যায় প্রকাশ করবেন। সদাপ্রভুতে অটল থাক, এবং তাঁর করুণার জন্য অপেক্ষা কর; যে আপন পথে কৃতকার্য হয়, তার বিষয়ে, যে ব্যক্তি কুসংকল্প করে, তার বিষয়ে রুষ্ট হয়ো না। ক্রোধ নিবৃত কর, কোপ ত্যাগ কর, রুষ্ট হয়ো না, হলে কেবল দুষ্কর্ম করবে। কারণ দুরাচাররা উচ্ছিন্ন হবে, কিন্ত যারা সদাপ্রভুর অপেক্ষা করে, তারাই দেশের অধিকারী হবে। আর ক্ষণকাল পরে, দুষ্টলোক আর থাকবে না। তবে হ্যাঁ, যদিও তুমি তার স্থান তত্ত্ব করবে, কিন্ত সে আর নেই। কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হবে, এবং তারা শান্তির বাহুল্যে আনন্দ করবে। "-[যবূর (গীত সংহিতা) ৩৭:১-১১]

অনুরূপভাবে তওরাতে আমরা পাই,

"তোমার থলিতে একটি ছোট এবং একটি বড়, দুই ধরণের বাট্‌খারা না থাকুক। তোমার ঘরে একটি ছোট এবং একটি বড়, দুই ধরণের পরিমাণপাত্র না থাকুক। তুমি যথার্থ ও ন্যায্য বাট্‌খারা রাখবে, যথার্থ ও ন্যায্য পরিমাণপাত্র রাখবে; যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতে যাচ্ছেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়। কারণ যে কেউ ঐরূপ কাজ করে, যে কেউ অন্যায় করে, সে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর ঘৃণিত।" [দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:১৩-১৬]

অতএব বিশ্ব নেতৃবর্গ এবং বিশেষত: আপনার উচিত, বল প্রয়োগে শাসনের ধারণা পরিত্যাগ করা এবং দুর্বলের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত হওয়া। এর বিপরীতে ন্যায় ও শান্তির বিস্তার ও প্রসারে প্রাণপণ চেষ্টা করুন। এরূপ করার ফলে, আপনারা নিজেরাও শান্তিতে থাকবেন, আপনাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে আর বিশ্ব শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমার প্রার্থনা এই যে আপনি এবং অন্যান্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আমার বার্তাকে অনুধাবন করবেন; আপনাদের অবস্থান ও মর্যাদা উপলব্ধি করবেন এবং আপনাদের দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL, UK

হিজ এক্সিলেন্সী
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতি
মাহমুদ আহমেদিনেজাদ
তেহরান

৭ মার্চ ২০১২

প্রিয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বিশ্বে যে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে তার আলোকে, আমি অনুভব করেছি যে আমার পক্ষ থেকে আপনাকে লেখা আবশ্যক, যেহেতু আপনি ইরানের রাষ্ট্রপতি, আর তাই আপনি সেই সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের কর্তৃত্ব রাখেন যা আপনার জাতি এবং বিস্তৃত পরিসরে পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে। বিশ্বে বর্তমানে খুব উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে, অপরদিকে পরাশক্তিগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক দেশ তার কর্মকাণ্ডে অন্য কোন দেশকে হয় সমর্থন করছে বা বিরোধিতা করছে; তবে, ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হচ্ছে না। পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র থাকায় পৃথিবীতে পারস্পরিক আক্রোশ ও শত্রুতা বেড়েই চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রায় নিশ্চিতভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত। যেমনটি আপনি অবগত আছেন, নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের সহজপ্রাপ্যতার কারণে সম্ভাব্য তৃতীয়

বিশ্বযুদ্ধ এক পারমাণবিক যুদ্ধ হবে। এর চূড়ান্ত ফল হবে ভয়াবহ এবং এরূপ যুদ্ধের সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ হিসেবে জন্মগ্রহণ করবে।

আমার বিশ্বাস যে সেই মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী হিসেবে, যিনি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং যিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন- সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত, আমরা বিশ্বের এমন পরিণতি কামনা করি না, আর করতে পারিও না। এ কারণে আপনার কাছে আমার অনুরোধ যে, যেহেতু ইরানও বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, এর উচিত একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিহত করতে নিজ ভূমিকা পালন করা। এটা অনস্বীকার্য সত্য যে বড় বড় শক্তিগুলোর কথায় ও কাজে বা শত্রু-মিত্রের সাথে আচরণে দ্বৈততা থাকে। তাদের অন্যায়-অবিচারের ফলে বিশ্ব জুড়ে অস্থিরতা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু আমরা এটিও অস্বীকার করতে পারি না যে, কিছু কিছু মুসলমান গোষ্ঠী অসঙ্গত আচরণ করে থাকে, এমন আচরণ যা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থি। বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলো একে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করেছে আর তাদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে দুর্বল ও দরিদ্র মুসলমান দেশগুলোতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। অতএব, আমি আপনাকে আবারো অনুরোধ করছি যে, আপনার উচিত বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে রক্ষা করার জন্য আপনার সকল প্রচেষ্টা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করা। পবিত্র কুর'আন মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, কোন জাতির সাথে শত্রুতা যেন ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা থেকে তাদের দ্বিধাগ্রস্ত না করে। সূরা আল মায়েদা-তে আল্লাহতা'লা আমাদের আদেশ দেন,

"আর মসজিদে হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাধা দেয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন সীমালঙ্ঘনে তোমাদের প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।"-[৫:৩]

অনুরূপভাবে পবিত্র কুর'আনে একই সূরাতে আমরা মুসলমানদের জন্য এ আদেশও পাই:

"হে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন

কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার করো। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ পুরোপুরি অবহিত।” - [৫:৯]

সুতরাং কেবলমাত্র শত্রুতা ও ঘৃণার কারণে অপর কোন জাতির বিরোধিতা করা উচিত নয়। আমি স্বীকার করি যে ইসরায়েল সীমা লঙ্ঘন করে থাকে, এবং তাদের দৃষ্টিও ইরানের দিকে। নিশ্চয় যদি কোন দেশ আপনার দেশের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করে, নিজের প্রতিরক্ষার ন্যায়সঙ্গত: অধিকার আপনাদের রয়েছে। তবে যতদূর সম্ভব বিরোধসমূহ কূটনৈতিকভাবে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা উচিত। আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে বিরোধসমূহ নিরসনের প্রয়াসে সংলাপকে ব্যবহার করুন। যে কারণে আমি আপনাকে এ অনুরোধ করছি তা এই যে, আমি খোদাতা’লার সেই মনোনীত ব্যক্তির উত্তরসূরী যিনি এ যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত দাসরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবিও করেছেন। তাঁর লক্ষ্যই ছিল আমাদের প্রভূ ও পথপ্রদর্শক, রাহমাতুল্লিল আলামীন-জগতসমূহের প্রতি রহমত স্বরূপ প্রেরিত মহানবী (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে মানবজাতিকে খোদাতা’লার নিকটবর্তী করা আর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহতা’লা মুসলিম উম্মাহকে এ অনুপম সুন্দর শিক্ষা বুঝার তৌফিক দান করুন।

ওয়াস্‌সালাম।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের
পঞ্চম খলিফা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL, UK

৮ মার্চ ২০১২

রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি
দি হোয়াইট হাউস
১৬০০ পেনসিলভেনিয়া এভিনিউ এন.ডব্লিউ.
ওয়াশিংটন ডি.সি.

প্রিয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়,

বিশ্বে উদীয়মান উদ্বেগজনক পরিস্থিতির আলোকে আমি অনুভব করেছি যে আপনাকে আমার লেখা প্রয়োজন, যেহেতু আপনি এমন একটি দেশ যা বিশ্বের একটি পরাশক্তি - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, আর এ কারণে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেয়ার কর্তৃত্ব আপনার রয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং বিস্তৃত পরিসরে পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে।

বিশ্বে বর্তমানে খুবই বিক্ষুব্ধ ও অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ সকল সংঘর্ষে আক্রান্ত এলাকাগুলোতে পরাশক্তিগুলো তাদের শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে আমরা দেখি যে প্রায় প্রত্যেক দেশ অন্য কোন দেশের পক্ষে বা বিপক্ষে বিভিন্নভাবে সক্রিয় রয়েছে; তবে ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হচ্ছে না।

পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। বড়-ছোট এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র থাকাতে জাতিতে-জাতিতে আক্রোশ ও সংঘাত বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে উপনীত হয়ে পড়েছে। এরূপ যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে পারমাণবিক মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হবে; আর তাই আমরা বস্তুত:পক্ষে বিশ্বকে ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ধাবমান দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি এমন পথ অবলম্বন করা হত যা আমাদেরকে সমতার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচারের দিকে নিয়ে যেত তবে, আমাদেরকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে হত না, যেখানে এটি পুনরায় অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে।

যেমনটি আমরা সকলে অবহিত আছি, যে মূল বিষয়গুলো পৃথিবীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল তা হল লীগ অফ নেশন্স-এর ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক মন্দা, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৩২ সালে। আজ শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সাথে ১৯৩২ সালের পরিস্থিতির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির কারণে আবারো ছোট ছোট দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করেছে, আর দেশগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিণামে এর ফলে এমন শক্তিসমূহ সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে যারা আমাদেরকে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। যদি ছোট ছোট দেশগুলোতে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধসমূহের নিস্পত্তি সম্ভব না হয়, এর ফলস্বরূপ বিশ্বে নতুন মেরুকরণ ও গ্রুপিংয়ের উদ্ভব হবে। এটিই হবে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। তাই আমার বিশ্বাস যে আজ, বিশ্বের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা এ ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করি। মানবজাতির জন্য আশু প্রয়োজন তার সেই একক খোদাকে চেনার, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা; কেননা একমাত্র সেটাই মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দান করতে পারে; নতুবা বিশ্ব ক্রমাগত দ্রুতগতিতে আত্মহননের পথে অগ্রসর হতে থাকবে।

আপনার, এবং সমুদয় বিশ্ব নেতার, কাছে আমার আবেদন যে বলপ্রয়োগে অন্য জাতির দমনের বদলে আপনারা কূটনীতি, সংলাপ ও প্রজ্ঞার পথ অবলম্বন করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বিশ্বের বড় বড় শক্তির আজ উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজ ভূমিকা পালন করা। ছোট ছোট দেশের কোন আচরণকে বিশ্বের সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা উচিত হবে না। বর্তমানে কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও বড় বড় শক্তিগুলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী নয়; বরং আজ তুলনামূলকভাবে ছোট দেশের হাতে এরূপ গণ-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র বিদ্যমান, যেখানে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের একাংশ এমন যুদ্ধবাজ নেতা যারা কোন চিন্তা বা বিবেচনা ছাড়াই কাজ করে থাকেন। তাই, আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে বিশ্বের ছোট-বড় শক্তিগুলো যেন তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা না করে সে জন্য আপনার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। আমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয় যে, আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই তাহলে এরূপ যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কেবল এশিয়া, ইউরোপ ও দুই আমেরিকা মহাদেশের গরীব দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমাদের কর্মের বীভৎস পরিণতি বহন করতে হবে এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মগ্রহণ হতে থাকবে। তারা কোন দিন তাদের সেই সব পূর্বসূরীদের ক্ষমা করবে না যারা বিশ্বকে এক সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে। কেবলমাত্র আমাদের নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমাদের উচিত আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করা এবং তাদের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা। খোদাতা'লা আপনাকে এবং সকল বিশ্বনেতাকে এ বার্তা অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL, UK

৮ মার্চ ২০১২

মি. স্টিফেন হারপার
ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী
অটোয়া, অন্টারিও

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

বিশ্বে উদীয়মান ভয়াবহ পরিস্থিতির আলোকে আমি অনুভব করেছি যে আপনাকে আমার লেখা প্রয়োজন, যেহেতু আপনি ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী, আর এ কারণে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেয়ার কর্তৃত্ব আপনার রয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং বিস্তৃত পরিসরে পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে।

বিশ্বে বর্তমানে খুবই বিক্ষুব্ধ ও অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ সকল সংঘর্ষে-আক্রান্ত এলাকাগুলোতে পরাশক্তিগুলো তাদের শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে আমরা দেখি যে প্রায় প্রত্যেক দেশ অন্য কোন দেশের পক্ষে বা বিপক্ষে বিভিন্নভাবে সক্রিয় রয়েছে; তবে, ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হচ্ছে না।

পরিতাপের বিষয় যে, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি যে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। বড়-ছোট এত বেশি সংখ্যক দেশের হাতে নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্র থাকাতে জাতিতে-জাতিতে আক্রোশ ও সংঘাত বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে উপনীত হয়ে পড়েছে। এরূপ যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে পারমাণবিক মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হবে; আর তাই আমরা বস্তুত:পক্ষে বিশ্বকে ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে ধাবমান দেখতে পাচ্ছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যদি এমন পথ অবলম্বন করা হত যা আমাদেরকে সমতার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচারের দিকে নিয়ে যেত তবে, আমাদেরকে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি দেখতে হত না, যেখানে এটি পুনরায় অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছে।

যেমনটি আমরা সকলে অবহিত আছি, যে মূল বিষয়গুলো পৃথিবীকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল তা হল লীগ অফ নেশন্স-এর ব্যর্থতা ও অর্থনৈতিক মন্দা, যার সূচনা হয়েছিল ১৯৩২ সালে। আজ শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদগণ বলেন যে, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সাথে ১৯৩২ সালের পরিস্থিতির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করি যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলির কারণে আবারো ছোট ছোট দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করেছে, আর দেশগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। পরিণামে এমন শক্তিসমূহ সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবে যারা আমাদেরকে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাবে। যদি ছোট ছোট দেশগুলোতে রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিরোধসমূহের নিস্পত্তি সম্ভব না হয়, এর ফলস্বরূপ বিশ্বে নতুন মেরুকরণ ও গ্রুপিং-এর উদ্ভব হবে। এটিই হবে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। তাই আমার বিশ্বাস যে আজ, বিশ্বের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করে, এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় যে, আমরা এ ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা জোরদার করি। মানবজাতির জন্য আশু প্রয়োজন তার সেই একক খোদাকে চেনার, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা; কেননা একমাত্র সেটাই মানবজাতির অস্তিত্ব

রক্ষার নিশ্চয়তা দান করতে পারে; নতুবা বিশ্ব ক্রমাগত দ্রুতগতিতে আত্মহননের পথে অগ্রসর হতে থাকবে।

অনেকের কাছেই ক্যানাডা বিশ্বের সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ দেশগুলোর অন্যতম হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আপনার দেশ সাধারণতঃ অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করে না। তদুপরি, ক্যানাডার জনগণের সাথে আমাদের, অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের, বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই, আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে বিশ্বের ছোট-বড় শক্তিগুলো যেন তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা না করে সে জন্য আপনার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন।

আপনার এবং সমুদয় বিশ্ব নেতার, কাছে আমার আবেদন যে বলপ্রয়োগে অন্য জাতির দমনের বদলে আপনারা কূটনীতি, সংলাপ ও প্রজ্ঞার পথ অবলম্বন করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বিশ্বের বড় বড় শক্তির আজ উচিত শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজ ভূমিকা পালন করা। ছোট ছোট দেশের কোন আচরণকে বিশ্বের সম্প্রীতি বিঘ্নিত করার অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা উচিত হবে না। বর্তমানে কেবল যুক্তরাষ্ট্র ও বড় বড় শক্তিগুলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী নয়; বরং আজ তুলনামূলকভাবে ছোট দেশের হাতে এরূপ গণ-বিধ্বংসী মারণাস্ত্র বিদ্যমান, যেখানে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের একাংশ এমন যুদ্ধবাজ নেতা যারা কোন চিন্তা বা বিবেচনা ছাড়াই কাজ করে থাকেন। তাই, আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে, তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের সূচনা যেন না হয় সে জন্য আপনার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। আমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত না যে, আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই তাহলে এরূপ যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কেবল এশিয়া, ইউরোপ ও দুই আমেরিকা মহাদেশের গরীব দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহকে আমাদের কর্মের বীভৎস পরিণতি বহন করতে হবে এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মগ্রহণ হতে থাকবে। তারা কোন দিন তাদের সেই সব পূর্বসূরীদের ক্ষমা করবে না যারা বিশ্বকে এক সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে। কেবলমাত্র আমাদের নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমাদের উচিত

আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহের কথা চিন্তা করা এবং তাদের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা। খোদাতা'লা আপনাকে, এবং সকল বিশ্বনেতাকে এ পয়গাম অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

হারামাইন শরীফাইন (দুই পবিত্র স্থান)-এর তত্ত্বাবধায়ক সৌদি আরব রাজতন্ত্রের বাদশাহ্‌র নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL, UK

২৮ মার্চ ২০১২

হারামাইন শরীফাইন (দুই পবিত্র স্থান)-এর তত্ত্বাবধায়ক
সৌদি আরব রাজতন্ত্রের বাদশাহ
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আল সাউদ
রিয়াদ, সৌদি আরব

সম্মানিত বাদশাহ আব্দুল্লাহ,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আজ আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপনের উদ্দেশ্যে আপনাকে লিখছি, কেননা হারামাইন শরীফাইন (দুই পবিত্র স্থান) এর তত্ত্বাবধায়ক ও সৌদী আরবের বাদশাহ্ হিসেবে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে আপনি এক অতি উচ্চ আসনে আসীন রয়েছেন। আর এর কারণ এই যে, ইসলামের দুই পবিত্রতম স্থান–মক্কা আল-মুকার্‌রমা এবং মদীনা আল-মুনাওওয়ারা– যার ভালোবাসা মুসলমানদের ঈমানের অংশ, আপনাদের দেশে অবস্থিত। এগুলো আধ্যাত্মিক উন্নতিরও কেন্দ্র আর তাই মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত। এর আলোকে সকল মুসলমান এবং সকল মুসলিম সরকার

আপনাকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এ মর্যাদা দাবি করে যে, এক দিকে মুসলিম উম্মাহ্‌কে সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেয়া আপনার দায়িত্ব আর অপরপক্ষে মুসলমান দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও সৌহার্দ্যের এক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আপনার সংগ্রাম করা উচিত। আপনার এ প্রয়াসও থাকা উচিত যেন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহমর্মিতা গড়ে উঠে এবং তারা যেন এর তাৎপর্য্য সম্পর্কে আলোকিত হয়।

رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

[অর্থাৎ : একে অপরের সহমর্মিতায়]

সর্বোপরি, সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার জোর প্রয়াসী হওয়া উচিত। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর খলীফা হিসেবে আমার অনুরোধ এই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও ইসলামের অন্যান্য ফিরকার মধ্যে বিদ্যমান আকীদাগত পার্থক্য সত্ত্বেও বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, যা ভালোবাসা ও শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এ সম্পর্কে বিশ্বকে অবহিত করতে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এর মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের তথা পুরো পৃথিবীর মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে যে ভূল ধারণাগুলো গেঁথে রয়েছে, সেগুলো দূর করতে আমরা সক্ষম হব। কোন জাতির শত্রুতা আমাদেরকে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। আল্লাহতা'লা পবিত্র কুর'আনের সূরা আল-মায়েদার ৩ নম্বর আয়াতে বলেন,

"আর মসজিদে হারামে তোমাদেরকে (প্রবেশ করতে) কোন জাতির বাধা দেয়ার (কারণে সৃষ্ট) শত্রুতা যেন সীমালঙ্গনে তোমাদের প্ররোচিত না করে। আর তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।" (৫:৩)

এটি সেই কেন্দ্রীয় নীতি যা আমাদেরকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যেন ইসলামের অনন্যসুন্দর চিত্র বিশ্বের সামনে উপস্থাপনের যে দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত তা আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসাা ও গভীর সহানুভূতি থেকেই আমি এ ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা রাখার জন্য আপনাকে আহ্বান করছি।

আজ আমরা পৃথিবীতে দেখে থাকি যে কতিপয় রাজনীতিবিদ ও তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর অবমাননার উদ্দেশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ বপন করে চলেছেন। তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা পবিত্র কুর'আনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপনের চেষ্টা করে থাকেন। তদুপরি, ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের সংঘাতময় পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি হচ্ছে আর ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সহিংসতা এমন উচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছে যে তাদের সম্পর্ক গুরুতরভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এমন পরিস্থিতি দাবি করে যে মুসলিম উম্মাহ্র গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে আপনি এ বিরোধসমূহ ন্যায় ও সমতার সাথে নিস্পত্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন। ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা যেখানেই আর যখনই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন তা দূরীকরণের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সাধ্যানুযায়ী সর্বোচ্চ চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু যত দিন সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ একতাবদ্ধ হয়ে এ বিষয়ে উদ্যোগী না হবে তত দিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

তাই, এ বিষয়ে সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিবেন এটাই আমার অনুরোধ। যদি পরিণামে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নির্ধারিত থাকে, তবু আমাদের অন্তত চেষ্টা করা উচিত যে তার সূচনা যেন কোন মুসলমান দেশ থেকে না হয়। বিশ্বের কোথাও অবস্থিত কোন মুসলিম দেশ বা মুসলিম ব্যক্তি আজ অথবা ভবিষ্যতে কখনো এমন এক বিশ্বজোড়া ধ্বংসযজ্ঞের সূত্রপাত করার দায় নিতে চাবেন না যার দীর্ঘ মেয়াদী ফলস্বরূপ পরবর্তী প্রজন্মসমূহ বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম লাভ করবে। কেননা আজ যদি কোন বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয় তবে নিশ্চিতভাবে তা নিউক্লিয়ার মারণাস্ত্রের দ্বারা সংঘটিত

হবে। ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের দু'টো শহরে যখন নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হয়েছিল তখন পারমাণবিক যুদ্ধের সর্ববিধ্বংসী ভয়াবহতার একটি ঝলক মাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

অতএব, হে সৌদী আরবের বাদশাহ্! বিশ্বকে নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য আপনার সর্বশক্তি ও প্রভাবকে নিয়োজিত করুন। সর্বশক্তিমান আল্লাহতা'লার সাহায্য ও উদ্ধারকারী শক্তি আপনার সাথী হোক, আমীন। আপনার এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের জন্য দোয়ার সাথে।

"তুমি আমাদেরকে সরল সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর" (১:৬)

ওয়াস্‌সালাম.

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়ারের নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL
যুক্তরাজ্য

৯ এপ্রিল ২০১২

হিজ এক্সিলেন্সী
গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের স্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়ার
মিস্টার ওয়েন জিয়াবাও
ঝংনানহাই, চীন

প্রিয় প্রিমিয়ার মহোদয়,

আমি এ পত্র আপনার কাছে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধির মারফত প্রেরণ করছি। তিনি আমাদের ইসরায়েলের কাবাবীর সম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট এবং চীনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিষয়ক মন্ত্রীর আমন্ত্রণে তিনি চীনে যাচ্ছেন। চীনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিষয়ক উপ-মন্ত্রীসহ এক চীনা প্রতিনিধি দল কাবাবীরে আমাদের মিশন হাউজ দর্শনের জন্য আগমনকালে চীনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধির পরিচয় হয়।

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামের সেই ফিরকা যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেই মসীহ ও সংস্কারক, যার এ যুগে মুসলমানদের পথপ্রদর্শনের জন্য মাহদীরূপে, খ্রিস্টানদের পথ প্রদর্শনের জন্য মসীহরূপে আর সমগ্র

মানবজাতির সংশোধনের জন্য সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হওয়ার কথা ছিল তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এসে গেছেন। তিনি ভারতের কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। ১৮৮৯ সালে তিনি সর্বশক্তিমান খোদাতা'লার আদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯০৮ সালে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তত দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ এ জামা'তে প্রবেশ করে। তাঁর মৃত্যুর পরে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৫ম খলীফার যুগ চলছে আর আমিই প্রতিশ্রুত মসীহের ৫ম খলীফা।

আমাদের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় এই যে, এ যুগে ধর্ম যুদ্ধের অবসান হবে। উপরন্তু, আমরা এ বিশ্বাস রাখি যে কেউ যদি কোন শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আগ্রহী হয় তবে তা কেবলমাত্র ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের স্পৃহা নিয়ে এবং এরূপ পরিবেশে হওয়া উচিত যেন তিনি শান্তি, সমঝোতা ও সম্প্রীতির উৎসে পরিণত হন। এ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় সারা পৃথিবীতে প্রচার ও প্রসার করছে। আজ বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে বহু মিলিয়ন অনুসারীর মাঝে এ সম্প্রদায় প্রসার লাভ করেছে।

আমি আপনাকে এ বার্তাটি পৌঁছাতে চাই যে, বিশ্ব আজ এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত মনে হয় যে, আমরা দ্রুতগতিতে একটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আপনি এক বৃহৎ পরাশক্তির নেতা। এ ছাড়া বিশ্বের জনসংখ্যার এক অতি বড় অংশ আপনার শাসনাধীনে বসবাস করে থাকে। জাতিসংঘে প্রয়োজনের সময় ভেটো প্রদানের অধিকারও আপনাদের রয়েছে। অতএব এ প্রেক্ষাপটে, আপনার নিকট আমার অনুরোধ, যে ধ্বংস আমাদের সম্মুখে ঝুলছে তা থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা উচিত।

চীনে, বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পর, অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছিল। মাননীয় মাও সেতুং, যিনি আপনাদের জাতির এক মহান নেতা ছিলেন, উচ্চ নৈতিক মানের ভিত্তি রচনা করেছিলেন, যাকে অন্য ভাষায় মানবীয় মূল্যবোধসমূহের সর্বোচ্চ মান হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে। যদিও আপনারা

খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন, আর আপনাদের নীতিসমূহ নৈতিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আমি স্পষ্ট করতে চাই যে আমাদের খোদা, যিনি সেই খোদা যার পরিচয় ইসলাম ধর্ম তুলে ধরেছে, সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্য পবিত্র কুর'আন অবতীর্ণ করেছেন; আর কুর'আনে সেই সকল নৈতিক গুণাবলি শেখানো হয়েছে যেগুলো আপনারা অবলম্বন করে থাকেন, বরং তার বাইরেও আরো অতিরিক্ত নৈতিক দিক নির্দেশনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। মানবজাতির টিকে থাকার মাধ্যম ও মানবীয় মূল্যবোধসমূহ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে অনুপম সুন্দর শিক্ষাসমূহ এতে রয়েছে। যদি বিশ্ব– বিশেষত মুসলিম-বিশ্ব কুর'আনের শিক্ষাকে অবলম্বন করে, তবে সকল সমস্যা ও বিরোধের নিস্পত্তি হবে এবং শান্তি ও সম্প্রীতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি হবে।

আজ আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বজুড়ে এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অগ্রসর করার প্রয়াসে নিয়োজিত রয়েছে। আমাদের 'পীস সিম্পোজিয়াম' এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট শ্রেণীর তথা সর্বস্তরের মানুষের মধ্য থেকে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে আমার যে সভাসমূহ হয়ে থাকে, সেখানে আমি বিশ্বকে এ অপরিহার্য লক্ষ্য সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে থাকি। আমার দোয়া এই যে, বিশ্বের নেতৃবৃন্দ যেন প্রজ্ঞার সাথে আচরণ করেন এবং বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিদ্যমান পারস্পরিক শত্রুতাসমূহকে বিস্ফোরিত হয়ে এক বিশ্বজনীন সংঘাতে পরিণত হওয়ার সুযোগ না দেন। আপনার কাছেও আমার অনুরোধ যে বিশ্বের এক বিশাল পরাশক্তি হিসেবে, আপনারা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনাদের ভূমিকা রাখবেন। এক বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি থেকে বিশ্বকে রক্ষা করবেন; কেননা যদি এরূপ কোন যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, এর সমাপ্তি হবে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে। এটা খুবই সম্ভব যে এর ফলস্বরূপ বিশ্বের কোন কোন দেশের বা এলাকার কিছু অংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। একটি পারমাণবিক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রতিক্রিয়া কেবল তার তৎকালীন ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ বিকলাঙ্গ বা ত্রুটিযুক্ত হয়ে জন্ম লাভ করবে। সুতরাং মানবজাতিকে এরূপ ভীতিপ্রদ

পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য নিজ সর্বশক্তি, যোগ্যতা ও সম্পদ ব্যয় করুন। পরিণামে এরূপ করা আপনার জাতির জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে। আমার দোয়া এই যে, বিশ্বের ছোট-বড় সকল দেশ এ বাণী অনুধাবন করুক।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে,

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর নিকট পত্র
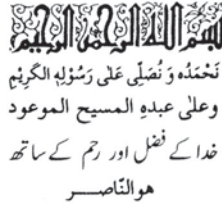
১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL, UK

গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী
রাইট অনারেবল ডেভিড ক্যামেরন
১০ ডাউনিং স্ট্রীট, লন্ডন
SW1A 2AA
যুক্তরাজ্য

১৫ এপ্রিল ২০১২

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়,

বিশ্ব বর্তমানে যে বিপজ্জনক ও সংকটময় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে, তার আলোকে আমি অনুভব করেছি যে আপনাকে আমার লেখা প্রয়োজন। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেয়ার কর্তৃত্ব আপনার রয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং বৃহত্তর পরিসরে পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে। আজ বিশ্বের জন্য শান্তির প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক, কেননা বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরের সংঘাতসমূহ আজ বিশ্বজনীন সংঘাতে পরিণত হওয়ার হুমকি দিচ্ছে। আমরা দেখি যে, আজকে বিশ্বের অবস্থা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই ১৯৩২ সালের পরিস্থিতির সাথে সাদৃশ্য রাখে। আরো অনেক মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে, যেগুলো একত্র করলে, ঠিক সেই চিত্র সামনে আসে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনালগ্নের প্রাক্কালে বিরাজ

করছিল। যদি এ স্ফুলিঙ্গগুলো প্রকৃত অগ্নিশিখায় পরিণত হয়, তবে আমরা এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যাবলি প্রত্যক্ষ করবো। ছোট-বড় অনেকগুলো দেশের হাতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র থাকায় এমন যুদ্ধে নিঃসন্দেহে পারমাণবিক সমরাস্ত্র ব্যবহৃত হবে। আজ যে সমস্ত অস্ত্র রয়েছে সেগুলো এত বিধ্বংসী যে এর ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্মে শিশুর মারাত্মক জেনেটিক ও শারীরিক ক্রটি নিয়ে জন্ম লাভের ঝুঁকি রয়েছে। জাপান বিশ্বের একক দেশ যা পারমাণবিক যুদ্ধের বীভৎস পরিণাম প্রত্যক্ষ করেছে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিউক্লিয়ার বোমা এর উপর ব্যবহৃত হয় এবং এ দু'টো শহরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। অথচ সে সময় যে নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল যার ফলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছিল সেগুলো আজকের কোন কোন ছোট দেশের হাতে থাকা পারমাণবিক অস্ত্রের চেয়ে অনেক কম শক্তিশালী। অতএব এটা পরাশক্তিগুলোর দায়িত্ব যে একত্রে আলোচনায় বসে মানবতাকে ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করা।

যে বিষয়টি অনেক ভীতির সঞ্চার করে তা এই বাস্তবতা যে, ছোট ছোট দেশের হাতে যে নিউক্লিয়ার সমরাস্ত্র আছে তা ঐ সকল যুদ্ধবাজ লোকদের হাতে গিয়ে পড়তে পারে যারা নিজেদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে হয় চিন্তা করতে সক্ষম নয় বা এ বিষয়ে কোন পরোয়া করে না। যদি বড় বড় শক্তিগুলো ন্যায়ের সাথে আচরণ না করে এবং ক্ষুদ্রতর দেশগুলোর অভিযোগ-অস্থিরতার নিরসন না করে, তাহলে এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং পরবর্তীতে যে ধ্বংস আসবে তা আমাদের অনুমান ও কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এমনকি বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুয়, যারা শক্তিশালী, তারাও ধ্বংসযজ্ঞের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে।

তাই, এটি আমার আন্তরিক কামনা ও দোয়া যে আপনি এবং বিশ্বের সকল বড় দেশের নেতৃবৃন্দ এ ভীতিপ্রদ বাস্তবতাকে অনুধাবন করবেন এবং এ জন্য আগ্রাসী নীতি অবলম্বন ও বল প্রয়োগে নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের পরিবর্তে আপনারা এমন নীতিসমূহ অবলম্বনের আপ্রাণ চেষ্টা করবেন যা ন্যায়ের প্রসার ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে।

যদি আমরা নিকট অতীতের দিকে তাকাই, ব্রিটেন বহু দেশের উপর শাসন করেছে এবং ন্যায় ও ধর্মীয় স্বাধীনতার উঁচু মান স্থাপন করেছে, বিশেষত: পাক-ভারত উপমহাদেশে। যখন আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহামান্য রানী ভিক্টোরিয়াকে তাঁর হীরক জয়ন্তীতে অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তিনি বিশেষ দোয়া করেছিলেন যেন খোদাতা'লা ব্রিটিশ সরকারকে ন্যায় ও সমতার সাথে শাসনের জন্য উদার হাতে পুরস্কৃত করে। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে এর ন্যায়-নীতি এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আজকের পৃথিবীতে উপমহাদেশের উপর ব্রিটিশ সরকারের শাসন নেই, কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতার মূলনীতি এখনো ব্রিটিশ সমাজে ও আইনে গভীরভাবে প্রোথিত, যার মাধ্যমে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমান অধিকার প্রদান করা হয়। এ বছর মহামান্য রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ-এর হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হচ্ছে, যার ফলে বিশ্বের সামনে ব্রিটেনের ন্যায়-নীতি ও সততার মান উপস্থাপনের এক সুযোগ ব্রিটেন লাভ করেছে। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে আমরা সব সময় এ ন্যায়-নীতিকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করেছি যখনই ব্রিটেন তা প্রদর্শন করেছে আর আমাদের প্রত্যাশা এই যে, ভবিষ্যতেও ব্রিটিশ সরকারের মৌলিক চরিত্রের মধ্যে ন্যায়-নীতি সব সময় অটুট থাকবে, কেবল ধর্মীয় ক্ষেত্রে নয় বরং সর্ব ক্ষেত্রে আর আপনি আপনাদের জাতির অতীত গুণাবলি কখনো ভুলে যাবেন না এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্রিটেন তার ভূমিকা পালন করবে।

এটা আমার অনুরোধ যে, প্রত্যেক স্তরে এবং প্রত্যেক আঙ্গিকে আমাদেরকে ঘৃণার আগুন নির্বাপিত করার সর্বোচ্চ প্রয়াস নিতে হবে। কেবলমাত্র যদি আমরা এ চেষ্টায় সফল হতে পারি তবেই আমাদের অনাগত প্রজন্মসমূহের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিতে পারবো। কিন্তু যদি এ কাজে আমরা ব্যর্থ হই, তবে আমাদের মনে কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই যে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের কারণে সর্বত্র আমাদের পরবর্তী প্রজন্মসমূহকে আমাদের কর্মের ভয়াবহ পরিণাম বহন করতে হবে আর পৃথিবীকে এক

বিশ্বজনীন বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কখনো তাদের অগ্রজদের ক্ষমা করবে না। আমি আবার স্মরণ করাচ্ছি যে ব্রিটেন ঐ সকল দেশের অন্যতম যারা উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রভাব রাখতে পারে এবং রেখে থাকে। আপনারা চাইলে ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতার দাবি পূরণ করে বিশ্বের পথ দেখাতে পারেন। তাই ব্রিটেন এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তির উচিত বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা। সর্বশক্তিমান খোদা আপনাকে ও অন্যান্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এ বার্তা অনুধাবনের সুযোগ দান করেন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

জার্মানির চ্যান্সেলরের নিকট পত্র
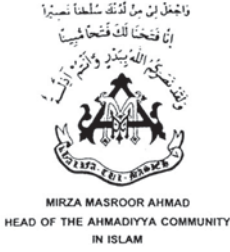
১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL
যুক্তরাজ্য

হার এক্সিলেন্সী
জার্মানির চ্যান্সেলর
এ্যান্জেলা মার্কেল
বুনডেসকান্যলেরাম্ট
উইলি-ব্রান্ড্ট-এসটিআর ১
১০৫৫৭ বার্লিন

১৫ এপ্রিল ২০১২

চ্যান্সেলর মহোদয়,

বিশ্বে উদীয়মান ও অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতির আলোকে আমি অনুভব করেছি যে আপনাকে আমার লেখা প্রয়োজন। বিশ্বে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী একটি দেশ জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেয়ার কর্তৃত্ব আপনার রয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং পুরো বিশ্বের ভবিষ্যতের উপর প্রভাব রাখবে। আজ যখন বিশ্ব বিভিন্ন জোটে বিভক্ত হচ্ছে, চরমপন্থিতা বেড়েই চলেছে আর আর্থিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হচ্ছে, তখন আশু প্রয়োজন সব ধরনের বিদ্বেষ নির্মূল করে শান্তির ভীত রচনা করা। এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন এক এক করে প্রত্যেকের প্রতিটি আবেগ-অনুভূতির প্রতি সম্মান

জানানো হয়। অপরপক্ষে, যেহেতু এটি যথাযথভাবে সততার ও সদিচ্ছার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে না, সেহেতু বিশ্ব পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা দেখি যে অধিকাংশ দেশ ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করছে না, আর এর ফলে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। অগণিত ছোট-বড় দেশ আজ নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী। তাই যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়, তবে সম্ভাবনা খুব বেশি যে তা সনাতন অস্ত্রের দ্বারা সংঘটিত হবে না, বরং পারমাণবিক অস্ত্র তাতে ব্যবহৃত হবে। একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধে যে ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হবে তা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, আর এর প্রভাব কেবল সেই মুহূর্তের ধ্বংসলীলায় সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং পরবর্তী প্রজন্মসমূহ এর দীর্ঘমেয়াদী কুফল ভোগ করবে এবং গুরুতর শারীরিক ও জেনেটিক ত্রুটি নিয়ে জন্ম লাভ করতে থাকবে।

তাই, আমার বিশ্বাস যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, প্রকৃত ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, আর সকল মানুষের অনুভূতি ও ধর্মীয় আচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। আমি স্বীকার করি যে অনেক পশ্চিমা দেশ অনুগ্রহ করে তাদের নিজ নিজ দেশে গরীব ও অনুন্নত দেশের মানুষদের স্থায়ী বসবাসের অনুমতি দিয়েছে, আর তাদের মধ্যে মুসলমানেরাও রয়েছে। সন্দেহ নেই যে, সংখ্যালঘু কিছু তথাকথিত মুসলমান রয়েছে যারা অত্যন্ত অসঙ্গত আচরণ করে থাকে এবং তা পশ্চিমা জাতিসমূহের মানুষের মনে অনাস্থার জন্ম দেয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে তাদের আচরণের সাথে ইসলামের সামান্যতমও সম্পর্ক নেই। এরূপ চরমপন্থীরা প্রকৃত অর্থে সেই মহানবী (সা.) কে ভালোবাসেন না যিনি পৃথিবীতে শান্তি, সম্প্রীতি ও সমঝোতার বাণী নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্যই হাতে গোনা কিছু বিভ্রান্ত লোকের আচরণকে আমাদের ধর্মের প্রতি আপত্তি উত্থাপনের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আন্তরিক ও নির্দোষ মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। কোন সমাজে শান্তি একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া এবং একে তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যখন সকল পক্ষ সমবেতভাবে পারস্পরিক সমঝোতার লক্ষ্যে কাজ করে। কিন্তু, পশ্চিমা সমাজের মানুষের অন্তরে বিদ্যমান অনাস্থার কারণে, জাতিতে-জাতিতে ও মানুষে-মানুষে

সম্পর্ক উন্নতির পরিবর্তে কতিপয় অমুসলিমের প্রতিক্রিয়ার দিন দিন অবনতি হচ্ছে এবং তা মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে।

আমরা লক্ষ্য করি যে, কতিপয় মুসলিম গোষ্ঠির বিভ্রান্ত আচরণের অজুহাতে সততা ও ন্যায়ের পরিবর্তে কিছু কিছু বৃহৎ শক্তির নিজস্ব স্বার্থোদ্ধারকে প্রাধান্য দেয়া হয়। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলোর কোন কোনটি বিশেষ কিছু দেশের অর্থ ও সম্পদে তাদের সহজ প্রবেশাধিকার বজায় রাখতে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশসমূহ যেন সেই একই সম্পদে পূর্ণ প্রবেশাধিকার না পায় তা নিশ্চিত করতে আগ্রহী। এ জন্য যে সিদ্ধান্তসমূহ নেয়া হয় অনেক সময়ই তার উদ্দেশ্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা বা মানুষকে সাহায্য করা নয়। উপরন্তু আরেকটি বড় বিষয় যা বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্তরালে কাজ করছে তা হল চলমান অর্থনৈতিক সংকট, যা আমাদেরকে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যদি সততা প্রদর্শন করা হত তাহলে এ দেশগুলোর কোন কোনটি ন্যায়সঙ্গত সমঝোতার ভিত্তিতে যথাযথ শিল্প ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একে অপরের নিকট হতে ন্যায়সঙ্গতভাবে উপকৃত হতে পারতো। তারা অন্যের সম্পদে অন্যায়ভাবে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতো না, বরং একত্রে বসে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিত একে অপরকে সহায়তা করার চেষ্টা করতো। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বিশ্বে বিদ্যমান বিশৃংখলার গোড়ায় একটি সার্বজনীন কারণ রয়েছে, আর তা হল, ন্যায়ের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যা ব্যাপক অস্থিরতা ও ক্ষোভের সঞ্চার করছে।

তাই এটা আমার অনুরোধ একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে রক্ষার জন্য আপনারা আপনাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা পরিচালিত করবেন। সামনে উপস্থিত ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে আপনাদের সমস্ত শক্তি, সম্পদ ও প্রভাবকে নিয়োজিত করুন। বিভিন্ন রিপোর্টে সংবাদ এসেছে যে, জার্মানি ইসরায়েলকে তিনটি আধুনিক সাবমেরিন প্রদান করবে যেগুলো নিউক্লিয়ার অস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে। একজন জার্মান প্রফেসর বলেছেন যে

এরূপ সিদ্ধান্ত ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে বিদ্যমান উত্তেজনাকেই কেবল বাড়িয়ে তুলবে। আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে আজ কেবল বিশ্বের বড় শক্তিগুলোই নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী নয়, বরং তুলনামূলক ছোট অনেকগুলো দেশের হাতেও আজ পারমাণবিক অস্ত্র বিদ্যমান। যা আরো বেশি উদ্বেগজনক তা এই যে, এসব ছোট ছোট দেশের কোন কোনটির নেতারা যুদ্ধবাজ এবং বাহ্যত এরূপ অস্ত্র ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কে বেপরোয়া। অতএব পুনরায় এটা আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার সর্বোচ্চ প্রয়াস গ্রহণ করবেন। যদি আমরা এতে ব্যর্থ হই তবে কোন সন্দেহ নেই যে এক নিউক্লিয়ার সংঘাতের ফলে ব্যাপক ধ্বংস সাধিত হবে, ফলস্বরূপ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে, যারা কখনো এরূপ বিশ্বজনীন দুর্ভোগের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পূর্বসূরীদের ক্ষমা করবে না। সর্বশক্তিমান খোদা আপনাকে ও সকল বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এ বার্তা অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে,

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্‌স, লন্ডন
SW18 5QL, UK

ফরাসী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি
হিজ এক্সিলেন্সী ফ্রাসোঁয়া অলান্দে
প্যালেইজ দ্য এলিসী
৫৫ রু দু ফাওবুর্ঘ সঁত-অনরে
৭৫০০৮ প্যারিস, ফ্রান্স

১৬ মে ২০১২

রাষ্ট্রপতি মহোদয়,

প্রথমত: ফ্রান্সের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাকে এ সুযোগে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটি নিঃসন্দেহে এক বিশাল দায়িত্ব যা আপনার উপর অর্পিত হয়েছে, আর তাই আমি আশা রাখি এবং দোয়া করি যেন ফ্রান্সের জনগণ, বরং পুরো পৃথিবী যেন আপনার নেতৃত্ব থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়। বিশ্বে দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতির আলোকে, আমি সম্প্রতি আপনার পূর্বসূরী রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সার্কোযি-কে একটি পত্র লিখেছিলাম। সেই পত্রে আমি রাষ্ট্রপতি সার্কোযিকে একজন বিশ্ব নেতা হিসেবে ন্যায়কে সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়েছিলাম এবং তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম যেন একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা প্রতিহত করতে তিনি যেন তাঁর সমস্ত শক্তি ও প্রভাবকে নিয়োজিত করেন। আমি অনুভব করেছি যে ফ্রান্সের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে আপনাকে আমার একই বার্তা নিয়ে লেখা প্রয়োজন, কেননা বর্তমানে এমন সিদ্ধান্তসমূহ নেয়ার কর্তৃত্ব আপনার হাতে অর্পিত হয়েছে যেগুলো আপনার দেশ এবং বৃহত্তর পরিসরে পুরো বিশ্বের উপর প্রভাব রাখবে। আমি বিশ্বাস করি যে, বিশ্বের সরকারসমূহের বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতি নিয়ে চরমভাবে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। জাতিসমূহের মধ্যে অন্যায়-অবিচার ও সংঘাতসমূহের গণ্ডী বাড়তে বাড়তে এক বিশ্বজনীন সংঘাতে উপনীত হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। বিগত শতাব্দীতে দু'টো বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশন্‌স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু ন্যায়ের দাবিকে পূর্ণ করা হয় নি, আর ফলস্বরূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়, যার পরিণতি ছিল আণবিক বোমার ব্যবহার। পরবর্তীতে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বিশ্ব শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, যুদ্ধসমূহ এড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তথাপি আজ আমরা দেখি যে, এক তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতোমধ্যেই রচিত হয়েছে। ছোট-বড় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ আজ আণবিক বোমার অধিকারী। যা উদ্বেগজনক তা এই যে, নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অধিকারী কোন কোন ক্ষুদ্রতর শক্তি এমন অস্ত্রের ব্যবহারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ ও দায়িত্বহীন। এটি অবান্তর নয় যে, যদি নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহৃত হয়, তবে এর ভয়ানক ফলাফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাবে এবং সে দিন হবে কেয়ামতসদৃশ। যে অস্ত্র আজ বিদ্যমান সেগুলো এত ব্যাপক-বিধ্বংসী যে এর ফলস্বরূপ শিশুদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম মারাত্মক জেনেটিক বা শারীরিক ত্রুটি নিয়ে জন্ম নিতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে, সেই একক দেশ যা আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছে, সেই জাপানে, যদিও সাত দশক অতিবাহিত হয়ে গেছে, নবজাত শিশুদের মধ্যে এর কুপ্রভাব আজও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

তাই এটি আমার বিনীত অনুরোধ যে মুসলিম এবং অমুসলিম বিশ্বের মধ্যে বিদ্যমান শত্রুতা ও অনাস্থাকে নির্বাপিত করতে আপনি আপনার সর্বোচ্চ প্রয়াস অবলম্বন করবেন। ইসলামের শিক্ষাসমূহ ও রীতি-নীতির বিষয়ে কোন কোন ইউরোপীয় দেশে উল্লেখযোগ্য আপত্তি রয়েছে এবং কোথাও কোথাও এর উপর কিছু বিধি-নিষেধও আরোপ করা হয়েছে, আর অন্যান্যরা এরূপ কিছু করার কথা বিবেচনা করছেন। কিছু কিছু চরমপন্থী মুসলিমের মনে ইতোমধ্যেই পাশ্চাত্যের প্রতি যে বিদ্বেষ রয়েছে, তা তাদেরকে এ ধরনের পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় অসংযত আচরণ করার পথে নিয়ে যেতে পারে, যার ফলশ্রুতিতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বিরোধ আরো বৃদ্ধি লাভ করবে। অথচ, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম, যা আমাদেরকে অন্যায়ের প্রতিরোধেও অন্যায় পথ অবলম্বনের শিক্ষা দেয় না। আমরা, আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়, এ নীতি অবলম্বন করে থাকি এবং আমরা সকল বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাস করি।

দুঃখজনকভাবে, আমরা লক্ষ্য করি যে, মুসলিমদের এক সংখ্যালঘু অংশ ইসলামের এক সম্পূর্ণ বিকৃত চিত্র উপস্থাপন করে এবং তাদের বিভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুসরণে আচরণ করে থাকে। ‘সমগ্র মানবতার জন্য রহমত’

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভালবাসার খাতিরে আমি বলছি যে, এসবকে প্রকৃত ইসলাম বলে বিশ্বাস করবেন না এবং এ ধরণের বিভ্রান্ত আচরণকে সংখ্যাগুরু শান্তিপূর্ণ মুসলমানের অনুভূতিতে আঘাত হানার লাইসেন্স হিসেবে ব্যবহার করবেন না। সম্প্রতি এক নির্দয় পাষাণ ব্যক্তি ফ্রান্সের দক্ষিণে বিনা কারণে কয়েকজন ফরাসী সৈন্যকে গুলি করে হত্যা করে, এবং এর কয়েক দিন পর এক স্কুলে প্রবেশ করে তিন নিষ্পাপ ইহুদি শিশু ও তাদের এক শিক্ষককে হত্যা করে। এ ধরনের নৃশংসতা অন্য মুসলিম দেশগুলোতেও নিয়মিত সংঘটিত হচ্ছে এবং এসব ঘটনা ইসলামের বিরোধীদেরকে তাদের বিদ্বেষ প্রকাশের এক সুযোগ করে দিচ্ছে এবং বৃহত্তর পরিসরে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এক অজুহাত প্রদান করছে। একজন মুসলমান হিসেবে, আমি এটি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করতে চাই যে ইসলাম কোন প্রকারে, কোন ধরনের নিষ্ঠুরতা ও নিপীড়নের কোন অনুমতি দেয় না। পবিত্র কুর'আন বিনা কারণে একজন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার সমতুল্য বলে গণ্য করেছে। এটি এমন এক নির্দেশ যা পূর্ণাঙ্গ এবং যার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। কুর'আনে আরো বলা হয়েছে যে, যদিওবা কোন দেশ বা জাতি তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তবুও তা যেন তাদের সাথে পরিপূর্ণ ন্যায় ও সঙ্গত আচরণ করা থেকে তোমাদেরকে বিরত না করে। শত্রুতা ও বিরোধ তোমাদেরকে প্রতিশোধপরায়ণতা বা অসম প্রতিক্রিয়া প্রকাশের পথে যেন অগ্রসর না করে। যদি তুমি বিরোধসমূহের সর্বোত্তম সমাধান কামনা কর, তবে বন্ধুত্বপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করতে প্রয়াসী হও। আমি এ বিষয়টি কৃতজ্ঞতার সাথে অনুভব করি যে অনেক পশ্চিমা দেশ দরিদ্র বা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের মানুষদের তাদের দেশে বসতি স্থাপনের সদয় অনুমতি প্রদান করেছে, যাদের মধ্যে মুসলমানেরাও অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চিতভাবেই, আপনার দেশেও অনেক মুসলমান বাস করেন এবং তারা আপনার নাগরিকও বটে। এদের অধিকাংশই আইনের প্রতি অনুগত এবং আন্তরিক। তদুপরি, ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা করে যে দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্ব জুড়ে এ নীতিই অবলম্বন করে এবং এরই প্রচার-প্রসার করে থাকে। আপনাদের কাছেও আমার বাণী এটিই যে, যদি ইসলামের এ প্রকৃত শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়ানো হয়, তবে প্রত্যেকেরই নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, বিশ্বের দেশে দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আপনার কাছে, তথা সকল বিশ্ব নেতার কাছে, আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, অন্যান্য দেশকে বলপ্রয়োগে পদানত করার পরিবর্তে আপনারা কূটনীতি, সংলাপ ও প্রজ্ঞার ব্যবহার করুন। ফ্রান্সের ন্যায় বিশ্বের বড় বড় শক্তিগুলোর শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজ ভূমিকা রাখা উচিত। ছোট ছোট দেশের আচরণকে বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত করার করার ভিত্তি হিসেবে তাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। তাই বিশ্বের ছোট-বড় শক্তিগুলোকে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে নিবারণ করার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াসী হওয়া বিষয়ে আপনাকে পুনরায় স্মরণ করাচ্ছি। আমাদের মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয় যে, যদি আমরা এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই, তাহলে এমন এক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞ কেবল এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার গরীব দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহকেও আমাদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি বহন করতে হবে এবং বিশ্ব জুড়ে সর্বত্র শিশুরা জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে থাকবে। আমার দোয়া এই যে, বিশ্বের নেতৃবর্গ প্রজ্ঞার সাথে আচরণ করবেন এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিদ্যমান সংঘাত ও শত্রুতাকে বিস্ফোরিত হয়ে এক বিশ্বজনীন সংঘাতে রূপ নেয়া থেকে বিরত রাখবেন। আল্লাহতা'লা আপনাকে, এবং সকল বিশ্ব নেতাকে, এ বিষয়টি অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে,

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েল্থ অঞ্চলের মহামান্য রানীর নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL
যুক্তরাজ্য

হার ম্যাজেস্টি রানী ২য় এলিজাবেথ
যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েল্থ অঞ্চলের রানী
বাকিংহাম প্যালেস
লন্ডন SW1A 1AA
যুক্তরাজ্য

২৯ এপ্রিল ২০১২

ইয়োর ম্যাজেস্টি,

আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান হিসেবে এবং বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু মিলিয়ন অনুসারীর পক্ষ থেকে হীরক জয়ন্তীর এ শুভক্ষণে মহামান্য রানীকে আমি আমার হৃদয় নিঙড়ানো অভিনন্দন জানাই। আমরা এ মহিমান্বিত উৎসবে অংশ নেয়ার সুযোগ পেয়ে মহান আল্লাহ্‌তা’লার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আহমদী মুসলিমদের মধ্যে যারা যুক্তরাজ্যের নাগরিক তারা এ হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে উৎফুল্ল ও গর্বিত। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকেও মহারানীর প্রতি আন্তরিক ও উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। খোদাতা’লা আমাদের মহানুভব রানীকে অনন্তর সুখী ও পরিতৃপ্ত রাখুন।

আমি মহান খোদাতা'লা, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের জীবন ধারণের জন্য একে গণনাতীত কল্যাণ দ্বারা পরিপূর্ণ করেছেন, যেন সর্বদা আমাদের রানীকে শান্তিতে ও নিরাপত্তায় রাখুন যার উদার শাসনের গণ্ডী অনেক সার্বভৌম ও কমনওয়েল্থভুক্ত দেশকে বেষ্টন করে। যেভাবে হার ম্যাজেস্টিকে ছেলে-বুড়ো তাঁর সকল প্রজা ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে, আমাদের দোয়া এই যে খোদার ফিরিশতারা যেন তাঁকে সেভাবে ভালোবাসতে শুরু করে। সর্বশক্তিমান মহান খোদা যেভাবে তাঁকে দুনিয়ার প্রাচুর্য্য দান করেছেন, ঠিক সেভাবে তাঁর উপর গণনাতীত আধ্যাত্মিক আশিষ ও কল্যাণ বর্ষণ করুন। এ আশিষের সুবাদে এমন হোক যে এ মহান জাতির সকল নাগরিক সর্বোচ্চ খোদাকে চেনার সৌভাগ্য লাভ করুক এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের সাথে বসবাস করতে থাকুক। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মত নির্বিশেষে যুক্তরাজ্যে সকল নাগরিক একে অপরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করুক, এমন পর্যায়ে যে এ আচরণের সুপ্রভাব ও ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া যেন এ দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। যে বিশ্বের অনেক অংশ আজ যুদ্ধ, বিশৃংখলা ও হানাহানিতে লিপ্ত তার পরিবর্তে এ বিশ্ব ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব এবং বন্ধুত্বের শান্তির নীড়ে পরিণত হোক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বের এ ক্রান্তিকালীন পতনোম্মুখ পরিস্থিতির উত্তরণে মহারানীর প্রজ্ঞা ও প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

গত শতাব্দীতে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যাতে কোটি কোটি প্রাণহানি ঘটে। আজ যদি জাতিসমূহের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধগুলো ক্রমাগত বাড়তে থাকে, এটি আরেক বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাতের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাবে। কোন বিশ্বযুদ্ধে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যবহারের সম্ভাবনার অর্থই হল বিশ্ব এতে অবর্ণনীয় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করবে। খোদা এমন দুর্যোগ সংঘটিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন এবং বিশ্ববাসীর মধ্যে প্রজ্ঞা ও শুভ চিন্তার উদয় হোক। হার ম্যাজেস্টির কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, হীরক জয়ন্তীর আনন্দঘন উৎসবকে এ জন্য কাজে লাগাবেন, মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহস্বরূপ, বড়-ছোট সমস্ত জাতির মানুষকে স্মরণ করিয়ে যে, তাদের সকলের উচিত পারস্পরিক ভালোবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের সাথে বসবাস করা।

এ প্রেক্ষাপটে, হীরক জয়ন্তীর এ শুভক্ষণে আমি হার ম্যাজেস্টিকে বিশ্বের নিকট এ বার্তা পেশ করার অনুরোধ করবো যে, সকল ধর্মের অনুসারীগণ এবং এমনকি যারা খোদায় বিশ্বাস করে না তাদেরও সকল সময় অপরাপর ধর্মের বিশ্বাসীদের অনুভূতিকে সম্মান করা উচিত। আজ বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির ছড়াছড়ি। একদিকে এগুলো শান্তি-প্রিয় মুসলমানদের মর্মাহত করে, অপরপক্ষে অমুসলিমদের হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা ও অনাস্থা গড়ে তুলে। তাই বিশ্বের সকল ধর্মের অনুসারী তথা বিশ্ব মানবতার প্রতি এটি অসাধারণ অনুগ্রহ ও দয়া হবে যদি হার ম্যাজেস্টি সকল ধর্মমত ও তাদের অনুসারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার বিষয়ে সকলকে পরামর্শ দেন। মহান খোদা আমাদের রানীকে এ উদ্দেশ্য পূরণে নিজ সাহায্য ও শক্তি দান করুন।

যেভাবে আমি পত্রের শুরুতে উল্লেখ করেছি, আমি বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান। এ কারণে আমি অতি সংক্ষেপে আমাদের সম্প্রদায়ের পরিচিতি তুলে ধরতে চাই। আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও সংস্কারক, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যার এ যুগে আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, তিনি কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ছাড়া আর কেউ নন। ১৮৮৯ সালে তিনি পবিত্র ও সৎকর্মপরায়ণ এক সম্প্রদায়- আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষ এবং খোদার মধ্যে একটি সম্পর্ক তৈরি করা এবং মানুষকে একে অপরের অধিকার আদায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করা, যেন তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির সাথে বাস করতে পারে। ১৯০৮ সালে যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর অনুসারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ)। তাঁর মৃত্যুর পর ঐশী পরিকল্পনায় খেলাফতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে এ অধম বান্দা প্রতিশ্রুত মসীহের পঞ্চম খলীফা। এভাবে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় বিশ্বজুড়ে এর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্যকে পূরণ করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। আমাদের পয়গাম হলো ভালোবাসা, সমঝোতা ও

ভ্রাতৃত্ববোধের আর আমাদের মূলমন্ত্র "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে"। নিশ্চিতভাবে ইসলামের অনুপমসুন্দর শিক্ষার সারাংশ এটি ধারণ করে।

এখানে এটা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, এটা ছিল একটি শুভ দৈবক্রম যে আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার যুগে হার ম্যাজেস্টি রানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সেই সময় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্টাতা 'রানীর জন্য উপহার' (তোহফায়ে কায়সারীয়া) শিরোনামে একটি বই লেখেন, যাতে তিনি রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতি এক অভিনন্দন বার্তা পেশ করেন। তাঁর বাণীতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) রানীকে তাঁর হীরক জয়ন্তীতে ভারত উপমহাদেশসহ তাঁর শাসনাধীন প্রজাগণ ন্যায়বিচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে পারায় তাঁকে অভিনন্দন জানান। তিনি ইসলামের সুন্দর শিক্ষাকে উপস্থাপন করেন এবং তাঁর আবির্ভাব ও দাবির উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। যদিও আজ ব্রিটিশ সরকার উপমহাদেশের মানুষদের স্বাধীনতা প্রদান করেছে, তথাপি এ বিষয়টি যে ব্রিটেনে সরকার বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ও ধর্মের মানুষকে এখানে বসবাসের সুযোগ দিয়েছে, আর তাদেরকে সমান অধিকার প্রদান করেছে, ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় মত প্রকাশের ও প্রচারের স্বাধীনতা দিয়েছে- তা ব্রিটেনের সহিষ্ণুতা অতি উঁচু মান সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট।

আজ যুক্তরাজ্যে হাজার হাজার আহমদী মুসলমান বাস করছে। তাদের অনেকেই নিজ দেশের অত্যাচার থেকে রক্ষার জন্য দেশ ত্যাগ করে এখানে আশ্রয়ের আবেদন করেছে। হার ম্যাজেস্টির উদার শাসনে (এখানে) তারা এক শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করেন, যেখানে তারা ন্যায়বিচার ও ধর্মের স্বাধীনতা লাভ করেন। এ অনুগ্রহের জন্য আমি পুনর্বার এ মহান রানীর প্রতি অন্তর থেকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি আমার পত্র শেষ করবো হার ম্যাজেস্টির জন্য নিম্নের দোয়ার সাথে, যা মূলত: সেই একই দোয়া যা আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হার ম্যাজেস্টি রানী ভিক্টোরিয়ার জন্য করেছিলেন:

"হে শক্তিশালী ও মহান খোদা! তোমার অনুগ্রহ ও আশিষে আমাদের সম্মানিত রানীকে চিরকাল আনন্দে রাখো, যেভাবে তাঁর অনুগ্রহশীল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনে আমরা আনন্দের সাথে বসবাস করছি। হে সর্বশক্তিমান খোদা! তাঁর প্রতি অনুগ্রহশীল ও স্নেহশীল হও, যেভাবে তাঁর উদার ও মহানুভব শাসনে আমরা শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বসবাস করছি।"

উপরন্তু, এটি আমার দোয়া যে খোদাতা'লা আমাদের সম্মানিত রানীকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে হেদায়াত দান করুন। সর্বশক্তিমান খোদা হার ম্যাজেস্টির বংশধরদেরও পথ প্রদর্শন করুন যেন তারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং অন্যদের এ পথ দেখানোর তৌফিক লাভ করেন। ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা সদা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের মূলনীতি হিসেবে অটুট থাকুক। আমি আবারো হার ম্যাজেস্টিকে এ মহানন্দের উৎসব উপলক্ষ্যে অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই। আমাদের মহান রানীকে আমার হৃদয়-নিঙড়ানো আন্তরিক অভিনন্দন।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে,

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বময় নেতার নিকট পত্র

১৬ গ্রেসেনহল রোড
সাউথফীল্ড্স, লন্ডন
SW18 5QL
যুক্তরাজ্য

১৪ মে ২০১২

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বময় নেতা
আয়াতুল্লাহ্ সৈয়দ আলী হোসেনী খামেনী
তেহরান, ইরান

সম্মানিত আয়াতুল্লাহ্,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আপনাকে ইরানে ইসলামের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন আর বর্তমানে ইরানের সরকারও আপনার অভিভাবকত্বে পরিচালিত হয়। এটি দাবি করে যে আমরা ইসলামের সঠিক চিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করি। মুসলমান হিসেবে বিশ্বকে শান্তি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সাথে বসবাসের শিক্ষা দেয়ার জন্য আমাদের প্রয়াসী হওয়া উচিত। বিশেষ করে, মুসলমান নেতাদের এ দিকে জরুরী দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এ জন্য আপনার কাছে আমার আবেদন যে,

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার সরকারের দায়িত্বের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। যদি ইরানের উপর আক্রমণ হয় তবে এর অধিকার আছে দেশ রক্ষায় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়ার, কিন্তু আগ্রাসনকে উসকে দেয়া ও কোন সংঘাতে প্রথম অগ্রসর হওয়া এর জন্য সমীচীন হবে না। বরং এক প্রচেষ্টা নেয়া উচিত যে, ধর্মীয় মতবিরোধ উপেক্ষা করে সাধারণ মূল্যবোধের ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়ার। এটিই সেই পদ্ধতি যা আমরা ইসলামের ইতিহাসে অবলম্বন হতে দেখতে পাই।

আমি আপনার কাছে এজন্য এ পত্র লিখছি যে, আমি সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী, তাঁর উত্তরসূরী এবং খলীফা। এ যুগে যার আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন সেটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নামে পরিচিত। আল্লাহর ফযলে আজ এ জামা'ত বিশ্বের ২০০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্বজুড়ে বহু মিলিয়ন নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী এতে শামিল হয়েছেন। আমাদের একনিষ্ঠ বাসনা যে বিশ্বকে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শান্তির সাথে বসবাসের পথ দেখাই। এ উদ্দেশ্যে আমি সর্বদা সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। এ জন্য আমি সম্প্রতি ইসরায়েলের প্রধান মন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য বিশ্ব নেতার কাছে লিখেছি। এ বিষয়ে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টকেও আমি লিখেছি।

একটি ইসলামি রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে, আমি আশা করি যে আপনি একমত হবেন যে, যদি পুরো মুসলিম উম্মাহ একতাবদ্ধ হয় ও একযোগে কাজ করে, তবে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আমাদের পারস্পরিক শত্রুতা ও অভিযোগসমূহে অর্থহীনভাবে ইন্ধন দেয়া আমাদের উচিত হবে না; বরং শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার সুযোগের সন্ধানে আমাদের থাকা উচিত। উপরন্তু, কারো সাথে শত্রুতা বা বিরোধ থাকলে সেটিও ন্যায়-বিবর্জিত হওয়া উচিত নয়। এ শিক্ষাই আমাদেরকে পবিত্র কুর'আনে দেয়া হয়েছে:

“হে যারা ঈমান এনেছ। তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। আর কোন জাতির শত্রুতা তোমাদের যেন কখনো অবিচার করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সদা ন্যায়বিচার করো। এ (কাজটি) তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ পুরোপুরি অবহিত।” - [৫:৯]

আল্লাহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ও সকল মুসলিম সরকারকে আমার বাণী অনুধাবনের তৌফিক দিন, যেন তারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

এটি মানবজাতির প্রতি আমার ভালোবাসা, যা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য ভালোবাসা থেকে উদ্ভূত; আর এ বিষয়টিও যে ‘সমগ্র মানবজাতির প্রতি রহমত’-এর উম্মতের আমি একজন সদস্য, যা আমাকে এ পত্র লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। আল্লাহ বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে আমার কথাগুলো বুঝার তৌফিক দিন এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় তারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করুন। অন্যথায় যদি কোন একটি দেশের তাড়াহুড়ো ও বিবেচনাহীনতা দু’টো দেশের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের সূত্রপাত করে, তবে এরূপ সংঘাত সেই দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং যুদ্ধের অগ্নিশিখা পুরো পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। অতএব এটি খুবই সম্ভব যে একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে যা গতানুগতিক অস্ত্রে লড়া হবে না বরং পারমাণবিক অস্ত্রে লড়া হবে। একটি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ফলাফল এত বীভৎস ও প্রলয়ংকরী হবে যে, এর পরবর্তী প্রভাব কেবল সে সময় পৃথিবীতে যারা বাস করবেন তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এরূপ যুদ্ধের দীর্ঘ মেয়াদী ফল ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহকে বিকলাঙ্গ ও ত্রুটিযুক্ত জন্ম লাভের ভয়াবহ ‘উপহার’ প্রদান করবে। এ জন্য কোন দেশেরই নিজেকে আশু ধ্বংস থেকে নিরাপদ বলে ধরে নেয়া উচিত হবে না।

অতএব আরো একবার, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নামে এবং মানবতার প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসার তাগিদে আমি আপনাকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার ভূমিকা পালন করতে অনুরোধ করছি।

শুভেচ্ছা ও দোয়ার সাথে।

ওয়াস্‌সালাম।

আপনার হিতকামনায়,

মির্যা মাসরূর আহমদ
নিখিল-বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের
পঞ্চম খলিফা

WORLD CRISIS
AND THE PATHWAY TO
PEACE

The world is passing through very turbulent times. The global economic crisis continues to manifest newer and graver dangers almost every week. The similarities to the period just before the Second World War continue to be cited and it seems clear that events are moving the world at an unprecedented pace towards a horrific third world war.

In this book, His Holiness Mirza Masroor Ahmad, the Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim Community warns the world of the fast approaching dangers and how it can avcrt disaster and chart a course to peace.

A Compliation of Speeches and Letters

of

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad[ai]

Imam and the Head of the

Worldwide Ahmadiyya Muslim Jama'at,

Fifth Successor to the Promised Messaih[as]

published by

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

ISBN : 978-984-991-201-9